প্রতিবেদন ১০১

রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের করণীয়

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, রোড ১১
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০ ২) ৯১৪৫০৯০, ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩
ফ্যাক্স: (৮৮০ ২) ৮১৩০৯৫১
E-mail: cpd@bdonline.com
Website: www.cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৯
স্বত্ব © সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

মূল্য টাকা ৮০.০০

ISSN 1818-1570 (Print)
ISSN 1818-1597 (Online)

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় অধ্যাপক রেহমান সোবহানের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিডি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হল অংশীদারিত্ব ও জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্য পূরণে সিপিডি গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সংলাপ আয়োজনসহ বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে আসছে।

সিপিডি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে নিয়মিত সংলাপ পরিচালনা করে থাকে যার মাধ্যমে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে মুক্ত আলোচনার স্বপক্ষে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সিপিডি সবসময় সচেষ্ট। এসব সংলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিপিডি বাংলাদেশের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ওপর দেশের জনগণের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সিপিডি সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ও পেশাজীবী জনগণ, ব্যবসায়ী মহল, জনপ্রতিনিধি, নীতিনির্ধারকবৃন্দ, সরকারি আমলা, উন্নয়ন-অংশীদারসহ বিশেষজ্ঞগণ, তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের নেতৃবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল গ্রুপসমূহকে নিয়ে নিয়মিত নীতি-সংলাপ আয়োজন করে থাকে। সিপিডি'র লক্ষ্য হল এ ধরনের সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সব নীতিমালার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেগুলোর পক্ষে ব্যাপক জনমত ও সমর্থন গড়ে তোলা। বিগত সময়ে এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সিপিডি একটি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে ও সুশীল সমাজের ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সংলাপ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব ও তথ্যগত ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সিপিডি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। সিপিডি'র প্রধান গবেষণা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: সামষ্টিক অর্থনীতির অবস্থা পর্যালোচনা; কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন; দারিদ্র্য বিমোচন; বাণিজ্য, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিশ্বায়ন; বিনিয়োগ ও উদ্যোগের প্রসার এবং অবকাঠামো উন্নয়ন; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ; মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা; এবং উন্নয়নের জন্য সুশাসন, নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠান।

সিপিডি'র গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও জ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য সিপিডি'র একটি সক্রিয় প্রকাশনা কর্মসূচিও (বাংলা ও ইংরেজি) রয়েছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিপিডি নিয়মিতভাবে 'সিপিডি সংলাপ প্রতিবেদন সিরিজ' (CPD Dialogue Report Series) প্রকাশ করে থাকে।

বর্তমান প্রতিবেদনটি ***রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের করণীয়*** শীর্ষক সংলাপের আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। সংলাপটি ১৮ আগস্ট ২০০৯ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন: *মিজ আপনান বানু*, প্রভাষক, শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
সহকারী সম্পাদক: *আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ*, পরিচালক, ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগ
সিরিজ সম্পাদক: *অধ্যাপক রেহমান সোবহান*, চেয়ারম্যান, সিপিডি

সংলাপ প্রতিবেদন
রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের করণীয়

সংলাপ প্রতিপাদ্য

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) গত ১৮ আগস্ট ২০০৯, মঙ্গলবার ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে 'রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের করণীয়' শীর্ষক একটি সংলাপের আয়োজন করে। সংলাপে সভাপতিত্ব করেন সিপিডি'র চেয়ারম্যান *অধ্যাপক রেহমান সোবহান*। *ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি,* মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে সংলাপে যোগ দেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি *মেহের আফরোজ, এমপি*। *বেগম সেলিমা রহমান,* যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, সংলাপে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সংলাপে নারী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ, তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক সংগঠক, সাংসদ, সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিক, নীতি নির্ধারক, সমাজকর্মী, উন্নয়নকর্মী, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, দাতা সংস্থার প্রতিনিধিসহ আরও অনেকে অংশগ্রহণ করেন ।

যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী *ড. রওনক জাহান* সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য হিসেবে *ড. জাহান* বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে এক্ষেত্রে গত তিন দশকের অগ্রগতির ধারা তুলে ধরেন। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে জাতীয় পর্যায়ে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাঁধাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এগুলো অপসারণে সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা প্রস্তাব করেন তিনি। তাঁর বিশ্লেষণ, তুলনামূলক পর্যালোচনা ও প্রস্তাবনার সূত্র ধরে একটি প্রাঞ্জল সংলাপের সূচনা হয়, যেখানে আলোচিত হয় বাংলাদেশের নারী-রাজনীতিকদের সংগ্রাম ও অর্জনের কথা, তাঁদের আত্মমর্যাদা নিয়ে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করার দুর্নিবার প্রচেষ্টার কথা; পাশাপাশি আলোচিত হয় প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর যোগ্যতার অবমুল্যায়নের কথা, নারীর হতাশা, বঞ্চনা ও দুর্দশার প্রতিচিত্র এবং নানাভাবে নারীকে মূলধারার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার সামাজিক-রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির কথা। মূলধারার রাজনীতিতে নারীর অর্থবহ অংশগ্রহণের বাঁধা হিসেবে সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অধস্তন অবস্থার প্রতিবাদের সুর প্রলম্বিত হয় এই সংলাপে। এই প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশে সংলাপটির মূল প্রতিপাদ্য ও বক্তব্যের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।

পরিচিতি ও সূচনা বক্তব্য

সভাপতি *অধ্যাপক রেহমান সোবহান* সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং উপস্থিত বক্তা ও অতিথিদের সাথে সকলকে পরিচয় করিয়ে সংলাপের সূচনা করেন। নারীর রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর প্রয়াসে নানা সময়ে নানা প্রতিশ্রুতি শোনা গেলেও অগ্রগতি হয়েছে খুবই সীমিত – এই মন্ত ব্য রেখে অধ্যাপক সোবহান এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয়টিতে প্রথমত গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার তাঁদের 'দিনবদলের সনদ'এ এ সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে অঙ্গীকারগুলো করেছে তার

একটি হল সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১০০ তে উন্নীত করা। নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তবে শুধু সংখ্যাগত প্রতিনিধিত্বই নয়, বরং একটি সত্যিকার অর্থে ক্ষমতায়িত নারী প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল নারীদের অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সংসদীয় পদ্ধতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরী বলে তিনি মনে করেন তিনি। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিষয়টি নিঃসন্দেহে আরও ত্বরান্বিত হবে, তবে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ সুযোগ কাজে লাগাতে একযোগে কাজ করতে হবে, যাতে করে বর্তমান সংসদের ন্যুনতম ১০ বছর মেয়াদকালে এসংক্রান্ত বিলটি সংসদে উত্থাপিত হয় ও পাশ করানো যায়, বলে মন্তব্য করেন *অধ্যাপক সোবহান*। সংসদে প্রয়োজনীয় আইন পাশের জন্য বিল উত্থাপনের প্রেক্ষিত তৈরীর একটি সচেতন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটবে এ সংলাপের মধ্য দিয়ে – এ আশা রেখে *অধ্যাপক সোবহান* অধ্যাপক রওনক জাহানকে তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপনার জন্য আহ্বান জানান। অধ্যাপক জাহানের প্রবন্ধ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের নানা সাফল্য, বিফলতা ও সমস্যার উপর আলোকপাত করে এ বিষয়ে একটি পূর্ণ ধারণা দেবার চেষ্টা করবে; যা এ সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণে ও আইনী পরিকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অধ্যাপক *ড. রওনক জাহান* তাঁর উপস্থাপনা শুরু করেন। গত ১০/১৫ বছরের আন্দোলন সত্ত্বেও রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্বায়নে অগ্রগতির হার তেমন আশানুরূপ ছিল না বলে মন্তব্য করেন *ড. জাহান*। তবে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া মহিলাদের জন্য ১০০ সংরক্ষিত আসনের প্রতিশ্রুতির বিষয়টি পরিবর্তনের হারকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। এবারের নির্বাচনে ১৯ জন মহিলা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন এবং এবারই প্রথম মহিলাদের গতানুগতিক ধারার বিপরীতে ক্যাবিনেট বণ্টন করা হয়েছে –এ সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক জাহান তাঁর বক্তব্য মূলত তিনটি পর্বে উপস্থাপন করেন: ১. বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, ২. দক্ষিণ এশিয়ার অভিজ্ঞতা এবং সবশেষে ৩. বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত। তিনটি পর্যায়ে তুলনামূলক আলোচনা শেষে অধ্যাপক জাহান বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে সবচেয়ে উপযোগী কর্মকৌশল কী হতে পারে; স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে এবং সবচেয়ে ভালো মডেলটি কী বা নির্বাচনী পদ্ধতি ও সংসদীয় আসন সংরক্ষণের সবচেয়ে ভালো বিন্যাসটি কী হতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অধ্যাপক জাহানের উপস্থাপিত প্রবন্ধের মূল বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হল।

১. <u>রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট</u>

বর্তমান অবস্থা

রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্বায়নে পৃথিবীব্যাপী একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হল, নারীরা মোট ভোটারদের শতকরা ৫০ ভাগ হলেও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে একটি বড় বৈষম্য রয়ে গেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে মাত্র ৯ শতাংশ সরকার প্রধান (প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান) মহিলা; মাত্র ১৮

শতাংশ হচ্ছেন মহিলা সাংসদ; স্পীকার পদে রয়েছেন মাত্র ১৩ শতাংশ মহিলা, আর রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্যপদে মাত্র ১৩ শতাংশ মহিলা রয়েছেন। রাজনৈতিক দলগুলোতে এত কম মহিলা থাকার কারণেই সংসদ সদস্য কিংবা মন্ত্রী পরিষদ সদস্য পদে নারীদের সংখ্যা এত কম, কেননা রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভূক্ত থাকা এ সমস্ত পদের প্রবেশের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে বলে *অধ্যাপক জাহান* অবহিত করেন।

এসব উপাত্তের সংখ্যাগত বিশ্লেষণ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে বিশ্বব্যাপী রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিতে অগ্রগতি কমই হয়েছে; আর যতটুকুও হয়েছে, আঞ্চলিক পর্যায়ে তাতেও অনেক পার্থক্য রয়েছে। সংসদ সদস্য পদে নারীদের সর্বাধিক প্রতিনিধিত্ব রয়েছে নরডিক দেশগুলোতে, অর্থাৎ সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং ফিনল্যান্ডে। এসব দেশে নারীর প্রতিনিধিত্ব শতকরা ৪১ ভাগ, অর্থাৎ জেন্ডার সমতা এসব দেশ প্রায় অর্জন করে ফেলেছে। আর সবচেয়ে কম নারী অংশগ্রহণ রয়েছে আরব দেশগুলোতে, শতকরা মাত্র ৯ ভাগ নারী সেখানে সংসদ সদস্য পদে রয়েছেন। আঞ্চলিক পর্যায়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো এ বিষয়ে বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। প্রায় ১৯৬০ এর দশক থেকেই এসব দেশে মহিলারা রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজনৈতিক দলপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসছেন। বাংলাদেশে ১৯৯১ সাল থেকে, অর্থাৎ প্রায় ২০ বছর ধরে মহিলা সরকার প্রধান রয়েছেন, যা কিনা একটি অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত। এছাড়াও ১৯৮০ সাল থেকে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের দলীয়-প্রধানও এদেশে মহিলা। একইভাবে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকাতেও মহিলারা সরকার প্রধান বা দলীয় প্রধান হিসেবে দীর্ঘদিন সফলভাবে কাজ করে আসছেন, যদিও এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে যে তাঁরা সকলেই বংশ পরম্পরায় বা উত্তরাধিকারসূত্রে রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন, পূর্ণ অর্থে নিজ যোগ্যতায় নয়। তবে *ড. জাহান* মনে করেন, এটিও বিবেচনায় রাখা দরকার যে এঁদের রাজনীতিতে প্রবেশ 'dynastic' হলেও এঁরা সকলেই ২০-২৫ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিলেন, সফলভাবে দেশ পরিচালনা করেছেন এবং জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতা ধরেও রেখেছেন। এটিও তাদের যোগ্যতারই পরিচায়ক।

এসব দেশের মন্ত্রী পরিষদ সদস্যপদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় শতকরা প্রায় ৮ থেকে ২৮ ভাগ মহিলা মন্ত্রী পর্যায়ে আছেন। তবে এক্ষেত্রেও আঞ্চলিক পর্যায়ে পার্থক্য রয়েছে। যেমন উন্নয়নশীল দেশগুলোর মাঝে আফ্রিকা বা ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে মেয়েরা প্রায় শতকরা ২৩ ভাগ পদে রয়েছেন। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে মাত্র শতকরা ৮ ভাগ মহিলা মন্ত্রী পরিষদ সদস্যপদে রয়েছেন। এর কারণ হল দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে মেয়েদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন বা কোটা নেই, যেখানে আফ্রিকা বা ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো কোটার মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়েছে।

নারী প্রতিনিধিত্বের অগ্রগতির হার (Rate of progress) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে গত ১০ বছরে এই হার ছিল খুবই ধীরগতিসম্পন্ন। ১৯৯৭ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত এই ১০ বছরে পৃথিবীব্যাপী সংসদ সদস্যপদে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা শতকরা ১২ ভাগ থেকে মাত্র ১৮ ভাগে উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রেও রয়েছে আঞ্চলিক তারতম্য। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর তুলনায় আমেরিকা বা সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলোর অগ্রগতির হার অনেক দ্রুত হয়েছে, কেননা এই দেশগুলো গত ১০-১৫ বছরে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন এবং কোটা পদ্ধতির বাস্তবায়ন জোরদার করেছে। রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্বের অঞ্চলভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায় উদীচ্য বা নরডিক দেশগুলো রয়েছে সবচেয়ে উপরে, আর অরব দেশগুলোর অবস্থান সবচেয়ে নিচে।

এসব উপাত্তের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যে হারে বর্তমান অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে, সে হারে এগিয়ে গেলে উন্নত দেশগুলোর রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণে জেন্ডার-সমতা (gender parity zone) অর্জন করতে, অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রায় ২০ বছর লাগবে, আর উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এই সময়সীমা হবে আনুমানিক ৪০ বছর।

ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা: কোটা পদ্ধতির ব্যবহার

এখন প্রশ্ন হল অগ্রগতির এই হারেই দেশগুলো সন্তুষ্ট থাকবে এবং ২০-৪০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, নাকি নারীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে বিশেষ পদক্ষেপ বা ইতিবাচক কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করবে? নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে নারী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টরা এত বছর ধরে কোন সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ না করে অপেক্ষা করার ব্যাপারে একমত নন। আর যে ইতিবাচক কর্মোদ্যোগটি এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী হাতিয়ার হিসেবে পৃথিবীব্যাপী ব্যবহৃত হয়েছে সেটি হল মেয়েদের জন্য কোটা পদ্ধতির প্রয়োগ। ১৯৯৫ সালের বেইজিং সম্মেলনেও পৃথিবীজোড়া কমবেশি একটি ঐকমত্য ছিল যে মেয়েদের জন্য ন্যুনতম এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। তবে কোটা পদ্ধতির পক্ষে-বিপক্ষেও রয়েছে নানা যুক্তি ও মতানৈক্য (contestations)। ড. জাহান এক্ষেত্রে কোটার পক্ষে-বিপক্ষের মূল যুক্তি-বিতর্ক ও মতানৈক্যগুলো সবিস্তারে তুলে ধরেন।

কোটা পদ্ধতির পক্ষে যুক্তিসমূহ (Arguments for the quota system)

কোটার পক্ষে চারটি মূল যুক্তি তুলে ধরেন ড. *জাহান*। এগুলো হল –

ন্যায়পরায়ণতা এবং পক্ষপাতহীনতা যুক্তি (Justice and fairness argument)

কোটার পক্ষে প্রথম ও প্রধান যুক্তিটি হল নারীদের সমান অংশগ্রহণ বা সমান প্রতিনিধিত্বের পথে যেহেতু অনেকগুলো কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা (structural barriers) রয়েছে, যেমন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক দায়দায়িত্ব, টাকাপয়সা বা সম্পদে অংশীদারীত্ব ইত্যাদি, এবং মেয়েরাই এসব প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছে, ছেলেদের ক্ষেত্রে এসব প্রতিবন্ধকতা নেই, সেহেতু মেয়েদের জন্য বিশেষ ইতিবাচক কর্মোদ্যোগ নেয়া উচিত এবং তা ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায্য হবে। সুতরাং ন্যায়পরায়ণতা এবং পক্ষপাতহীনতার বিচারে মেয়েরা যেসব কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয় কোটাকে তার ক্ষতিপূরণ (compensation) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

অভিজ্ঞতা বিষয়ক (The experience argument)

কোটার পক্ষে দ্বিতীয় যে যুক্তিটি রয়েছে সেটিতে বলা হয় সমাজে মেয়েদের অবস্থান যেহেতু ছেলেদের চেয়ে ভিন্ন, তাই মেয়েদের জীবন অভিজ্ঞতাও ছেলেদের থেকে ভিন্ন। একারণে মেয়েরা যেসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়, ছেলেরা সেগুলোকে একইভাবে বিবেচনা নাও করতে পারে। সামাজিকভাবে অধস্তন অবস্থার কারণে মেয়েরা যেসব প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছে, মেয়েদের সেসব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন রাজনীতিতে থাকতে হবে এবং সে অনুযায়ী মেয়েদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

আগ্রহ বিষয়ক (Interest group argument)

যেহেতু মেয়েদের জীবন অভিজ্ঞতা ছেলেদের থেকে ভিন্ন, এবং মেয়েরা নানা বৈষম্যের শিকার, সেহেতু মেয়েদের আগ্রহের ক্ষেত্রগুলোও ছেলেদের চেয়ে আলাদা। সুতরাং আগ্রহের এই ভিন্নতার প্রতিফলন থাকতে হবে।

অনুকরণীয় আদর্শ বিষয়ক (Role model argument)

সাধারণভাবে রাজনীতিতে আসতে মেয়েদের যেহেতু অনেক সময় লাগবে, তাই খুব দ্রুত যদি সংরক্ষণ এবং কোটার মাধ্যমে একটি critical mass of women আনা যায় তাহলে তাঁরা রোল মডেল হিসেবে কাজ করবেন এবং তাঁরা তখন অন্য নারীদের রাজনীতিতে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। সেকারণেই কোটার প্রয়োজন রয়েছে।

কোটা পদ্ধতির বিপক্ষের যুক্তিসমূহ (Contestations about the quota system)

এ প্রসঙ্গে তিনি কোটা সম্পর্কে ভারতীয় নারী আন্দোলনকারী ও রাজনীতিকদের অবস্থানের বিষয়টিকে উল্লেখ করে বলেন, ৫০ ও ৬০ এর দশকে তাঁরা কোটা পদ্ধতির ভীষণ বিপক্ষে ছিলেন, যদিও তাঁদের বর্তমান অবস্থান কোটার পক্ষে। কোটার বিপক্ষের যুক্তিগুলো নিম্নরূপ –

ক্ষতিপূরণ বনাম বৈষম্য (Compensation versus discrimination)

কোটাকে যদিও মেয়েদের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেখা হয়, এটি ছেলেদের বিরুদ্ধে একটি বৈষম্যও বটে। যদিও কোটার পক্ষের যুক্তি হল মেয়েরা যেহেতু আলাদা এবং কিছু বৈষম্যের শিকার সেজন্য মেয়েদেরকে এই ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে।

সমান সুযোগ বনাম সমান ফলাফল (Equality of opportunity versus equality of results)

এ বিষয়ে প্রশ্নটি হল কোটার মাধ্যমে আসলে কী চাওয়া হয়? এর উদ্দেশ্য কি সমান সুযোগ না সমান ফলাফল? যেমন বাংলাদেশের সংসদে যেসব সাধারণ আসন রয়েছে সেখানে মেয়েদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সমান সুযোগ রয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এসব আসনে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কিন্তু বছরের পর বছর এ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মেয়েরা নির্বাচিত হয়ে আসতে পারছে না, যেহেতু মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

ধারণার প্রতিনিধিত্ব বনাম সামাজিক প্রতিনিধিত্ব (Representation of ideas versus social representation)

উদ্দেশ্য যদি হয় ধারণা বা বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব, তবে সেটি নারীদের পক্ষে নারীকেই করতে হবে এমন কোন কথা নেই। পুরুষরাও নারীর হয়ে তাঁদের প্রয়োজনের কথা বলতে পারেন। সেক্ষেত্রে কোটার মাধ্যমে নারীর সশরীরে উপস্থিতি বা অংশগ্রহণ খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি হল কোটার বিপক্ষের অন্যতম যুক্তি।

শ্রেণী প্রতিনিধিত্ব বনাম সাধারণ প্রতিনিধিত্ব (Group representation versus universal representation)

এ বিষয়ে প্রশ্নটি হল কোটার মাধ্যমে যখন নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর কথা বলা হয়, তখন সংরক্ষিত কোটায় নির্বাচিত নারীরা আসলে কার প্রতিনিধিত্ব করেন? সংসদে তাঁরা কি শুধু একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অর্থাৎ নারীদের প্রতিনিধিত্ব করবেন না তাঁর এলাকার সকলের প্রতিনিধিত্ব করবেন? এক্ষেত্রে নারী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মতামত হল, সংরক্ষিত কোটায় নির্বাচিত এসব মহিলা প্রতিনিধি অবশ্যই মেয়েদের কথা বলবেন, কিন্তু তাঁরা সর্বসাধারণের প্রতিনিধি। সুতরাং তাঁরা সবার ব্যাপারেই কথা বলবেন, শুধু মহিলাদের বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবেন না।

দলীয় প্রতিনিধিত্ব বনাম দলীয় বৈচিত্র্য (Group representation versus diversity within the group)

দলীয় প্রতিনিধিত্ব এবং দলীয় বৈচিত্র্য বা বহুমুখিতা নিয়ে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মতবিভেদ রয়েছে। কারণ উন্নত দেশগুলোতে মেয়েদেরকে যদিও একটি বিশেষ দল হিসেবে দেখা হয়; সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিজ্ঞতা হল – মেয়েদের মধ্যেও নানা শ্রেণীপার্থক্য ও গোষ্ঠীগত বিভক্তি রয়েছে। কেননা মেয়েদের মধ্যে রয়েছে ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান, এবং আরও নানাবিধ পার্থক্য। অতএব শুধুমাত্র মহিলা হলেই হবে না, মহিলাদের মধ্যে যে বহুমুখিতা আছে – সেটি ধর্মের ভিত্তিতে হোক, আর্থসামাজিক দিক থেকে হোক, নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে হোক কিংবা অভিজ্ঞতার দিক থেকে হোক, যেমন কিছু মহিলা হয়তো ট্রেড ইউনিয়ন করছেন, কেউ রাজনীতি করছেন, কারোর অবস্থান তৃণমূলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে, কেউ বা সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আসছেন, তাঁদের সকলেরই যে বহুমুখী সমস্যা ও প্রয়োজন তার সবটারই প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

সংখ্যা বনাম গুণগত মান (Quantity versus quality)

কোটা দিয়ে হয়তো বা মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব খুব তাড়াতাড়ি সংখ্যায় বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তাঁদের অংশগ্রহণের গুণগত মান কোটা দিয়ে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

বিভিন্ন প্রকার কোটা (Types of quotas)

ড. জাহান তাঁর আলোচনায় চার প্রকার কোটা পদ্ধতি তুলে ধরেন, এ প্রকারভেদটি করা হয়েছে কোটাগুলোর সাংবিধানিক ভিত্তি রয়েছে কি নেই, সেই বিবেচনায়। অর্থাৎ এগুলো হয় আইনি প্রক্রিয়া দ্বারা রীতিসিদ্ধ, অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত (voluntary)। প্রথমত রয়েছে জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক কোটা (Constitutional Quota for National Parliaments) যেটি বাংলাদেশে রয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের কোটা হল নির্বাচনী আইনের আওতায় কোটা (Election Law Quota for National Parliaments), তবে এটি আবার দুরকম আছে – স্যান্‌কশন সহ ও স্যান্‌কশন ছাড়া। স্যান্‌কশন সহ কোটার ক্ষেত্রে, যে রাজনৈতিক দল এটি লঙ্ঘন করবে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র সংবিধান অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে। আর স্যান্‌কশন ছাড়া নির্বাচনী আইনের কোটার ক্ষেত্রে শুধু আইন আছে, তবে শাস্তির কোন বিধান নেই। সুতরাং এটি মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তৃতীয় প্রকার কোটা হল স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সাংবিধানিক বা আইনি কোটা (Constitutional or Legislative Quota at Sub-National Level)। সবশেষে হল নির্বাচনী

প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য রাজনৈতিক দলের কোটা (Political Party Quota for Electoral Candidates)। রাজনৈতিক দলের কোটাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। এ চার রকম কোটার মধ্যে লেজিসলেচারে দেয়া সাংবিধানিক কোটা সবচেয়ে দ্রুত কাজ করে বলে জানান ড. জাহান। এছাড়া রাজনৈতিক দলের কোটাগুলোও নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে খুব কার্যকর ভূমিকা রাখে বলে তিনি অবহিত করেন।

আইনি প্রক্রিয়ায় রীতিসিদ্ধতার পাশাপাশি জেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকেও কোটার প্রকারভেদ করা হয়, যেমনঃ নারী কোটা (Women's Quota), জেন্ডার কোটা (Gender Quota) এবং প্যারিটি (Parity)। নারী কোটা হল শুধুই মেয়েদের জন্য কোটা যেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে, যেটি আমাদের দেশে আছে। আর জেন্ডার বা লিঙ্গ কোটায় সংসদে নারী বা পুরুষের আসন শতকরা ৪০ ভাগের কম হতে পারবে না, আবার ৬০ ভাগের বেশিও হতে পারবে না, অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই এই কোটা প্রযোজ্য। নরওয়ে, স্পেন – এসব দেশে এধরনের জেন্ডার কোটার ব্যবহার দেখা যায়। আর তৃতীয় যে কোটা পদ্ধতিটি সেটি তুলনামূলকভাবে একটি নতুন ধারণা বা concept, ফ্রান্সে এ পদ্ধতিটির চর্চা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান আসন সংরক্ষণ করা হয়, অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ আসনে নারী এবং ৫০ ভাগ আসনে পুরুষ প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয়। কোটার এই পদ্ধতি সাধারণত যেখানে নির্বাচনী পদ্ধতিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional representation) থাকে সেখানেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, এবং এ ক্ষেত্রে মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর উপর নির্দেশ দেয়া থাকে যে তারা যখন প্রার্থী তালিকা পাঠাবে তাতে শতকরা ৫০ ভাগ নারী এবং বাকি ৫০ ভাগ পুরুষ প্রার্থীর নাম থাকতে হবে।

কোটার প্রকারভেদ আলোচনার পর ড. জাহান নারীদের জন্য শতকরা ন্যূনতম ৩০ ভাগ কোটা রয়েছে এমন ১৮টি দেশের নারী প্রতিনিধিত্বের সম্পর্কে উপাত্ত তুলে ধরেন। প্রাপ্ত তথ্য বিবরণী থেকে দেখা যায় ১৮টি দেশের মধ্যে ১১টি দেশ রাজনৈতিক দলের কোটা ব্যবহার করছে, ৭টি দেশ সংসদীয় কোটা ব্যবহার করছে, আর ৫টি দেশ আছে যারা দু'রকম কোটাই ব্যবহার করছে। এসব তথ্যের বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে, উন্নত দেশগুলো বিশেষত ইউরোপীয় দেশগুলোর মাঝে রাজনৈতিক দলের কোটা ব্যবহারের প্রবণতা বেশি, আর উন্নয়নশীল দেশ যেমন আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর ক্ষেত্রে সংসদীয় কোটা ব্যবহারের প্রবণতা বেশি। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় ইউরোপের দেশগুলো নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার দেশগুলোও ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে। আর দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র নেপাল এ তালিকায় জায়গা করে নিতে পেরেছে। এর কারণ হলো নেপাল বিগত নির্বাচনে নারীদের জন্য নানারকম কোটাভিত্তিক সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সুতরাং এই ১৮টি দেশের তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে যেটি স্পষ্ট হয় তা হল – নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে সবচেয়ে কার্যকর কোটা হচ্ছে রাজনৈতিক দলের কোটা। ইউরোপীয় দেশগুলো বেশিরভাগই স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক দলের কোটা ব্যবহার করছে এবং এর ফলে সেখানে নারী প্রতিনিধিত্ব খুব দ্রুত বেড়েছে। এ বিষয়ে *ড. জাহান* অভিমত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু নারীদের মূলধারার রাজনীতিতে আনবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো কাজ করে রাজনৈতিক দলের কোটাগুলো, সেহেতু বাংলাদেশে এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত।

নির্বাচনী পদ্ধতি (Electoral System)

কোটার পাশাপাশি অন্য যে বিষয়টি রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্বকে প্রভাবিত করে সেটি হল নির্বাচনী পদ্ধতি। *ড. জাহান* প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী পদ্ধতি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেন। তিনি মোট ১২ রকম নির্বাচনী পদ্ধতির উল্লেখ করেন যেগুলো অনুসরণকারী দেশসমূহের সংখ্যাসহ নিচের ছকে দেয়া হল।

নির্বাচনী পদ্ধতি	**অনুসরণকারী দেশের সংখ্যা**
লিস্ট প্রোপোরশনাল সিস্টেম (লিস্ট পিআর)	৫১
ফার্স্ট পাস্ট দি পোস্ট (এফপিটিপি)	৫০
টু-রাউন্ড সিস্টেম (টিআরএস)	২১
প্যারালেল সিস্টেম	২০
ব্লক ভোট (বিভি)	১৫
মিক্সড মেম্বার প্রোপোরশনাল (এমএমপি) সিস্টেম	৮
পার্টি ব্লক ভোট (পিবিভি)	৪
অল্টারনেট ভোট (এভি)	৩
সিঙ্গেল ট্রান্সফারেবল ভোট (এসটিভি)	২
সিঙ্গেল নন-ট্রান্সফারেবল ভোট (এসএনটিভি)	২
লিমিটেড ভোট (এলভি)	১
বরদা কাউন্ট (বিসি)	১

ছকের উপাত্ত থেকে দেখা যায় ১২ রকম পদ্ধতির মধ্যে প্রথম দুটি পদ্ধতি অর্থাৎ লিস্ট প্রোপোরশনাল সিস্টেম বা লিস্ট পিআর আর এফপিটিপি অধিকাংশ দেশ অনুসরণ করে। আমাদের দেশে অনুসরণ করা এফপিটিপি পদ্ধতি যেখানে একক সদস্য (single member district) এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা (simple majority) হল মূল বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ যিনি বেশি ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন। বাংলাদেশ ছাড়াও এ পদ্ধতি আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে প্রচলিত আছে। *ড. জাহান* এক্ষেত্রে উল্লেখ করেন যে, এফপিটিপি পদ্ধতিতে মেয়েদের এগিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন, আর প্রোপোরশনাল পদ্ধতিতে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো তুলনামূলকভাবে সহজ।

নির্বাচনী পদ্ধতি ও কোটার সর্বোত্তম বিন্যাস (Best fit combination of Electoral System & Quota)

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ও গবেষণা ফলাফল (ইউনিফেম ও অন্যান্য) থেকে দেখা যায় যেসব দেশে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নির্বাচনী পদ্ধতি রয়েছে, সেসব দেশের সংসদে নারী অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি। আর নির্বাচনী পদ্ধতি নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রেই নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে কোটা পদ্ধতি অনেকখানি প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যেসব দেশে নির্বাচনী পদ্ধতিতে পিআর পদ্ধতি অনুসৃত হয় এবং নারীদের জন্য বিশেষ কোটা রয়েছে, সেসব দেশে সবচেয়ে বেশি নারী অংশগ্রহণ রয়েছে। তার বিপরীতে যেখানে পিআর পদ্ধতি এবং কোটা কোনটাই নেই, সেখানে নারীদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে কম।

খুব তাড়াতাড়ি নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য কোটা এবং নির্বাচনী পদ্ধতির কোন্ সংযুক্তি বা বিন্যাসটি সবচেয়ে উপযোগী বা কার্যকরী হতে পারে, *ড. জাহান* এ বিষয়ে খানিকটা আলোকপাত করেন। তিনি যে বিষয়গুলো তুলে ধরেন সেগুলো নিম্নরূপ –

ক) নারী প্রতিদ্বন্দ্বিদের নিয়ে একটি আলাদা স্তর (Tier with women candidates only)
নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হল শুধু নারী প্রতিদ্বন্দ্বিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের একটি আলাদা স্তর তৈরি করা, যেমনটি বাংলাদেশে করা হয়। এখানে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত আসনে শুধু মেয়েরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

খ) লিস্ট পিআর এবং মনোনয়ন (List PR and nominations)
দ্বিতীয় যে বিন্যাসটি ভালো কাজ করে তা হল লিস্ট পিআর বা প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন, তার সঙ্গে মনোনয়ন। সেইসাথে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর কোটার ব্যাপারে কিছু ম্যান্ডেট থাকবে যে শতকরা কত হারে তারা আনুপাতিক কোটাগুলো রাখবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সুইডেনে ব্যবহৃত *জিপার* কোটার কথা। এক্ষেত্রে প্রার্থীর যে তালিকাটি পাঠানো হয় সেখানে প্রথমে যদি একজন নারী প্রার্থীর নাম থাকে, তাহলে তারপরে থাকে একজন পুরুষ প্রার্থীর নাম, তারপরে আবার নারী, তারপরে পুরুষ এভাবে। জিপার যেরকম জিগজ্যাগ করে যায়, তালিকাতে সেভাবে নাম দেয়া হয় এবং এভাবেই শতকরা ৫০ ভাগ নারী প্রার্থী চলে আসে।

গ) মিশ্র প্রার্থীর আনুপাতিক সংরক্ষিত আসন (Mixed member proportional reserved seats)
মিক্সড মেম্বার প্রোপোরশনাল মূলত পিআর বা প্রোপোরশনাল সিস্টেম। কিন্তু এখানে মেয়েদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা থাকে।

ঘ) ব্লক ভোট, মনোনয়ন এবং সংরক্ষিত আসন (Block vote, nominations and/or reserved seats)
চতুর্থ কম্বিনেশনটি হচ্ছে ব্লক ভোট, মনোনয়ন এবং সংরক্ষিত আসন। যেখানে ভোট দেয়ার সময় পার্টি বিবেচিত হয় সেখানে কোটা করে মেয়েদেরকে আনা সহজ, কিন্তু যেখানে ব্যক্তি দেখে ভোট দেয়া হয় সেখানে মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো তত সহজ নয়। ব্লক ভোট এবং সংরক্ষিত আসনের কম্বিনেশনটি মেয়েদের দ্রুত আনার ব্যাপারে ভালো কাজ করে।

কোটা পদ্ধতির বাস্তবায়ন সমস্যা (Implementation challenges of quota system)

ড. রওনক জাহান এ পর্যায়ে কোটা পদ্ধতির বাস্তবায়ন সমস্যাগুলোর প্রতি সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, কোটা পদ্ধতির অনেক ভালো দিক রয়েছে এবং অনেক দেশ কোটা অনেকখানি বাস্ত বায়নও করেছে। তবে এক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গেছে এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত কর্মকৌশল বের করা জরুরী। প্রথমত কোটার বাস্তবায়নে যে সমস্যাটির মুখোমুখি হতে হয় সেটি হল বহু বছর ধরেই বর্তমান সব আসনের বিপরীতে পুরুষ প্রার্থীরা রয়েছেন এবং সহসাই তারা এসব আসন ছাড়তে প্রস্তুত নন, সেটা সে প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশনেই হোক, কিংবা এফপিটিপিতেই হোক। যেহেতু এসব পুরুষ প্রার্থী বহু বছর ধরে দলীয় রাজনীতি করে আসছেন, ফলে তাদেরকে হঠাৎ করে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। এরকম পরিস্থিতিতে নরডিক দেশগুলো, যারা কোটার মাধ্যমে দ্রুত নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়িয়েছে, তাদের অভিজ্ঞতা হল মেয়েদের

কোটা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে তাদের প্রায় ৩ টি নির্বাচন, অর্থাৎ প্রায় ১৫ বছর লেগেছে। অনেকদিন ধরে যেহেতু রাজনীতিতে সক্রিয় পুরুষ প্রার্থীরা আছেন, প্রথম নির্বাচনে মেয়েদের নামটা তারা তাই পেছনের দিকে রেখেছেন। এরপরের নির্বাচনে মেয়েদের সংখ্যা এবং অগ্রাধিকার আরেকটু বাড়িয়েছেন, তারপরের নির্বাচনে আরেকটু বাড়িয়েছেন। এভাবে তারা নারীদের এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

তবে কোটা বাস্তবায়ন সম্পর্কে ভারতের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর প্রয়াসে ভারতের লোকসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের জন্য সংবিধানের একটি সংশোধনী আনা হয়। কিন্তু সেটি পাশ করানো সম্ভব হয়নি, কেননা এই ৩৩ শতাংশ হল বর্তমান আসনের ৩৩ শতাংশ, অর্থাৎ বর্তমান এসব আসনে ইতোমধ্যে অনেক পুরুষ প্রার্থী এবং কিছু মহিলা প্রার্থীও রয়েছেন। ইতোমধ্যে বহাল থাকা এসব প্রার্থী নারী প্রতিনিধিদের জন্য তাদের আসন ছাড়তে চাইছেন না। ফলে এর সম্ভাব্য সমাধান দেয়া হয় এভাবে যে প্রত্যেকেই আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন পালা করে (by rotation)। এক্ষেত্রে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা হল একটি নির্বাচনের পরেই একজনকে তার আসন ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। অথচ ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট সিস্টেমে, যেটি বাংলাদেশেও প্রচলিত, সেখানে বহুবছর ধরে একটি কন্সটিটিউয়েন্সি অর্থাৎ এলাকাভিত্তিক ভোটারদের দেখভাল করতে হয়, তা নাহলে হঠাৎ করে কেউ জিততে পারে না। অতএব একবার নির্বাচন করেই যদি আসনটি ছেড়ে চলে যেতে হয়, আর সেখানে যদি আবার নতুন লোক আসে, তাহলে প্রচলিত যে নির্বাচনী সংস্কৃতি তাতে এক্ষেত্রে নির্বাচনে জয়ী হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের মত সংরক্ষিত আসনের একটি আলাদা স্তর যেহেতু ভারত রাখেনি, বর্তমান আসনগুলোর উপরই সংরক্ষিত আসন চাওয়া হয়েছে, সেহেতু তা অকার্যকরই রয়ে গেছে।

কোটা বাস্তবায়নের আরেকটি বড় সমস্যা হল সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সময়-কাঠামোর অভাব। শতকরা কত হারে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো হবে, কত সময়ের মধ্যে তা করা হবে, কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সময়ের সাথে সাথে কৌশলগত কী কী পরিবর্তন আনতে হবে, বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে – এগুলো সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতি ৫ বছর পর পর অগ্রগতির হার মুল্যায়ন ও মনিটর করা এবং সে অনুযায়ী কৌশল গ্রহণেরও প্রয়োজন রয়েছে। মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনারও প্রকট অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন আমাদের দেশে মেয়েদের জন্য প্রশাসনিক পদে ১০ শতাংশ হিসেবে একটা কোটা রাখা হয়েছিল। কিন্তু কী ভাবে তা বাস্তবায়িত হবে, কী কী পদক্ষেপ এর জন্য নিতে হবে বা কত বছরে এই লক্ষ্য অর্জিত হবে তার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এক্ষেত্রে নেই। নরডিক দেশগুলো যেভাবে ৩টি ইলেকশন নিয়ে ধীরে ধীরে মেয়েদের কোটা বাস্তবায়ন করেছে এবং এই পুরো ১৫ বছর সময় ধরে তা মনিটর করেছে যাতে করে আগের নির্বাচন থেকে পরের নির্বাচনে এগিয়ে যাওয়া যায়, তেমনটা আমাদের দেশে করা হয়নি। অতএব কোটা করলেই হবে না, তা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনাও রাখতে হবে।

তৃতীয় যে বিষয়টিতে মনোযোগ দেয়া দরকার তা হল যোগ্য প্রার্থীদের একটি দল (pool) তৈরি করা, যাতে একটি নির্দিষ্ট আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যথেষ্ট নারী প্রতিদ্বন্দ্বি প্রস্তুত থাকেন। এ কারণে প্রয়োজনে নারী প্রার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তা নাহলে শুধু কোটা করে রাখা হলে, আর কোটায় আসবার মত যথেষ্ট যোগ্য নারী প্রার্থীর যোগান না থাকলে কোটা পদ্ধতির বাস্তবায়ন কোন কালেই হবে না।

সুতরাং এ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ থাকা জরুরী। যেমন আমেরিকাতে কোটা নেই, কিন্তু নারী আন্দোলনের সাথে সেখানে যাঁরা যুক্ত তাঁরা বিভিন্ন কনস্টিটিউয়েন্সিতে জিততে পারেন এমন সম্ভাব্য মহিলা রাজনীতিবিদদের একটি তালিকা তৈরি করে রাখেন, যেটাকে ওঁরা বলেন 'এমিলিস লিস্ট'। সেধরনের একটি তালিকা তৈরির প্রচেষ্টা থাকলে কোটা বাস্তবায়নের পথে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া যায়।

এক্ষেত্রে আরও যে চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে, শুধু কোটা করলেই হবে না, এসব কোটায় নারীদের মধ্যে যে বিভিন্নতা রয়েছে তার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। যেমন নৃতাত্ত্বিক, ধর্মভিত্তিক, অভিজ্ঞতাভিত্তিক – এসব কিছুরই প্রতিফলন থাকতে হবে নারীদের জন্য নির্ধারিত কোটায়।

আরেকটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হল কোটায় নির্বাচিত নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট কন্সটিটিউয়েন্সির অভাব। বিশেষত ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট সিস্টেমে সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকা (territorial or geographic constituency) না থাকলে কাজ করা যায় না। কিন্তু কোটায় নির্বাচিত নারীদের কাজ করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট এলাকা বা কন্সটিটিউয়েন্সি আমাদের দেশে নেই। ফলে তাদের পক্ষে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং কোটা পদ্ধতি চালু করার পাশাপাশি সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধিদের জন্য সুনির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করতে হবে।

এ বিষয়ে আর একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল – প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অর্থনৈতিক ও আরও অন্যান্য সম্পদের (resources) প্রয়োজন হয়। নারীদের জন্য এটি অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ, কেননা পুরুষদের তুলনায় নারীদের সম্পদ যোগানের ব্যবস্থা করার সম্ভাবনা (access) সীমিত। এ কারণে নারীরা অধিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়। ফলে তারা এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। এছাড়া শুধু প্রচুর টাকাপয়সার যোগান থাকলেই হয় না, সমর্থক গোষ্ঠীও (support group) থাকা প্রয়োজন। প্রশ্ন হল নারীদের ক্ষেত্রে এই সম্পদ কে যোগাবে? তাদের সমর্থন, নির্বাচনী প্রচারণা এগুলো কে করবে? তাদের টাকাপয়সার যোগান কি রাজনৈতিক দলগুলো দেবে, না মহিলা সংগঠনগুলো করবে? সুতরাং শুধু কোটা করলেই হবে না, পাশাপাশি এ বিষয়গুলোতেও মনোযোগী হতে হবে।

২. রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব: দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপট

নির্বাচনী পদ্ধতি ও কোটার প্রকারভেদ (Types of Electoral Systems and Quotas)

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে নির্বাচনী পদ্ধতি হিসেবে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালে এফপিটিপি অনুসৃত হয়, তবে নেপালে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিও চালু আছে। শ্রীলংকা লিস্ট পিআর পদ্ধতি অনুসরণ করে, আর পাকিস্তানে চালু রয়েছে দুটি ভিন্ন উপায়ের মিশ্র পদ্ধতি – লিস্ট পিআর ও প্লুরালিটি-মেজরিটি সিস্টেম। কোটার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে রয়েছে জাতীয় সংসদের মোট আসনের উপর ১৩ শতাংশ সাংবিধানিক কোটা এবং স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ৩৩ শতাংশ সাংবিধানিক বা লেজিসলেটিভ কোটা। বাকি দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র শ্রীলংকাতে কোনরকম কোটা নেই, আর সবদেশেই কোন না কোনরকম কোটা আছে। ভারতের লেজিসলেচারে কোন কোটা নেই, তবে রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে কেবল কংগ্রেস মনোনয়নে কোটা রেখেছে শতকরা ১৫ শতাংশ হারে। সে

কারণে ভারতীয় রাজনীতিতে মাত্র ১০ শতাংশ নারীর উপস্থিতি দেখা যায়, অর্থাৎ ভারত এক্ষেত্রে খুব ধীরে এগুচ্ছে।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে নারী প্রতিনিধিত্ব (Women's Representation in South Asian Parliaments)

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মাঝে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে নেপাল। নেপালে নারী প্রতিনিধিত্বের হার বর্তমানে ৩২ শতাংশের কিছু বেশি। কারণ নেপাল সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনে নারীদের জন্য নানারকম কোটার সুযোগ রেখেছে। যেমন ২০০৭ সাল থেকে ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট এবং প্রোপোরশনাল উভয় পদ্ধতিতেই ৩৩ শতাংশ হারে জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক কোটা রাখা হয়েছে নারীদের জন্য। ১৯৯৯ সাল থেকে জাতীয় সংসদের জন্য ইলেকশন ল কোটা রাখা হয়েছে ৫০ শতাংশ হারে। এছাড়াও মিউনিসিপাল নির্বাচনে ৪০ শতাংশ হারে নারীদের জন্য কোটার প্রবর্তন করেছে নেপাল। এভাবেই নারী প্রতিনিধিত্বে নেপাল দ্রুত অগ্রগতি লাভ করেছে। পাকিস্তানও অনেকটা এগিয়েছে কোটা দিয়ে, শতকরা ২২ ভাগ নারী বর্তমানে সেখানে রাজনীতিতে রয়েছেন। আর বাংলাদেশ শতকরা ১৮ ভাগ নারীর রাজনীতিতে অবস্থান নিয়ে তারপরের অবস্থানে রয়েছে। ভারতের ১০ শতাংশ নারীর পরে সর্বশেষ অবস্থানে রয়েছে শ্রীলংকা যেখানে রাজনীতিতে মাত্র প্রায় ৫ শতাংশ নারী । দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে নারী প্রতিনিধিত্বায়নে অগ্রগতির হার বিবেচনা করলে দেখা যায়, যেসব দেশে নারীদের জন্য কোটা রয়েছে, সেসব দেশে অগ্রগতির হার তুলনামূলকভাবে ত্বরান্বিত হয়েছে। নেপাল এবং বাংলাদেশে মন্ত্রী পরিষদ সদস্যপদ সহ সার্বিকভাবে নারীদের অবস্থানে বেশ অগ্রগতি হয়েছে।

৩. রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বর্তমান পরিস্থিতি (Current Status)

বর্তমানে বাংলাদেশে শতকরা ১০০ ভাগ সরকার প্রধান মহিলা। শতকরা ১৪ ভাগ মন্ত্রী পরিষদ সদস্যপদ এবং ১৯ ভাগ সংসদ সদস্যপদে মহিলারা রয়েছেন। বাংলাদেশের নারী এবং রাজনীতি বিষয়ে ২০০২ সালে প্রকাশিত[১] একটি প্রতিবেদনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাহী পদ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদসমূহে নারীদের উপস্থিতির বিশ্লেষণে দেখা যায় আওয়ামী লীগে সবচাইতে বেশি সংখ্যক নারী প্রতিনিধি রয়েছেন। বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি ক্রমান্বয়ে রয়েছে তার পরের অবস্থানে এবং জামায়াতে ইসলামীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে কোন নারী সদস্য নেই।

কোটা প্রবর্তনের আইনি পরিকাঠামোর বিবর্তন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৭৩ সালের সংবিধানে জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের বিপরীতে সংরক্ষিত নারী আসন ছিল ১৫টি অর্থাৎ প্রায় ৫ শতাংশ, ১৯৭৯ এর সংশোধনীতে তা এসে দাঁড়ায় ৩০ টিতে যা মোট আসনের প্রায় ৯ শতাংশ এবং ২০০৪ সালের সংশোধনীতে এটি বাড়িয়ে করা হয় ৪৫, যা মোট আসনের প্রায় ১৩ শতাংশ। নারী অংশগ্রহণের অগ্রগতির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সংসদে সাধারণ ৩০০ আসনের বিপরীতে ১৯৯১ ও ১৯৯৬ এর নির্বাচনে নারীদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসন থাকলেও ২০০১ এর নির্বাচনে কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না। ২০০৯ এ এসে আবার এ সংখ্যা বেড়ে ৪৫ এ উন্নীত হয়।

---
[১] Kamaul Uddin Ahmed, *Women and Politics in Bangladesh*

ফলে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের অগ্রগতির প্রবণতা ১৯৯১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেখা যায়, যা ২০০১ এ আকস্মিকভাবে কমে যায় কোন কোটার বরাদ্দ না থাকার কারণে। সরাসরি নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

কোটা সম্পর্কিত বিতর্ক (Debates over women's quotas)

মহিলাদের জন্য কোটা ও সংরক্ষিত আসন বাড়িয়ে ধীরে ধীরে রাজনীতিতে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ালেও, বাংলাদেশে কোটার প্রবর্তন নিয়ে অনেক আলোচনা, সমালোচনা ও বিতর্ক রয়ে গেছে। প্রধানত যে কারণে এই বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে তা হল কোটায় নির্বাচিত নারীরা সরাসরি নির্বাচনে আসছেন না, পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদেরকে আসতে হচ্ছে। এবং নারী আন্দোলনকারীদের কাছে এটি কাঙ্খিত নয়। কেননা পরোক্ষ নির্বাচনের অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে। জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্টে সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে যে সমস্যাগুলোর উদ্ভব হয় সেগুলো নিম্নরূপ –

প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত বিতর্ক (Representation): সংরক্ষিত আসনের নারীদের ভোট দিয়ে নির্বাচন করেন সংসদের ৩০০ সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। এক্ষেত্রে বিতর্কটি হল পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের নারীরা আসলে কাদের প্রতিনিধিত্ব করেন? তারা কি তাদের নির্বাচকদের প্রতিনিধিত্ব করেন, না সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন? আর যদি জনগণকেই তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়, সেটি তারা কীভাবে করবেন?

ক) জবাবদিহিতা বিষয়ক বিতর্ক (Accountability): সাধারণত নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের নির্বাচকদের কাছে জবাবদিহি থাকেন। সংরক্ষিত আসনের নারীরা যেহেতু সাধারণ আসনের ৩০০ প্রতিনিধির দ্বারা নির্বাচিত হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে তাদের জবাবদিহিতা আসলে কার কাছে? যারা তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচন করেছেন তাদের কাছে, নাকি সাধারণ নাগরিকদের কাছে?

খ) বলার অধিকার বিষয়ক বিতর্ক (Voice): সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারীরা আসলে কীভাবে এবং কতটা কার্যকরভাবে নারীদের ইস্যু, অর্থাৎ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন ইস্যুকে তুলে ধরতে সক্ষম?

গ) সম্পদের যোগান (Access to resources): অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সম্পদের যোগান। সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচিত প্রার্থীদের উন্নয়ন তহবিল ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে এবং এই তহবিল ব্যবহার করে নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন করার এখতিয়ারও তাদের আছে। তবে প্রকৃত পক্ষে সংরক্ষিত আসনের নারীরা সে সুযোগ পাচ্ছেনা; ফলে তারা প্রকৃত অর্থে কাজও করতে পারছেন না।

ঘ) রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও প্রশিক্ষণ (Political socialization and training): সংরক্ষিত আসন ও কোটার ধারণাটি অনন্তকালের জন্য নয়। ধরে নেয়া হয় যে এসব বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে এর পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী নারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাদের সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদেরকে সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রস্তুত করে তোলা প্রয়োজন। কারণ কোটা ও সংরক্ষিত আসন দীর্ঘমেয়াদে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পারে না, এগুলো সাধারণত সংখ্যাগতভাবে অগ্রগতি হয়েছে বোঝাতে সহায়তা করে। কিন্তু বাংলাদেশের বিগত ৩০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, কোটার মাধ্যমে নারীদের সংরক্ষিত আসনে

শুধু নির্বাচিত করে আনা হচ্ছে এবং সে কারণে সংখ্যায় নারীদের উপস্থিতি ধীর গতিতে হলেও বেড়ে চলেছে। তবে দীর্ঘমেয়াদী কোন পরিকল্পনা না থাকায় অর্থাৎ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অভাবে এসব নারী প্রতিনিধিদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন যেমন হচ্ছে না, তেমনি এসব নারীরা সরাসরি নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার মত যোগ্য ও দক্ষ হয়ে উঠতে পারছেন না। সেক্ষেত্রে তাঁদের রাজনৈতিক বিচরণের ক্ষেত্র সংরক্ষিত আসনের পরিগণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে, যা কাঙ্খিত লক্ষ্যের বিচ্যুতি নির্দেশ করে।

ঙ) নির্বাচনী এলাকা গঠন (Constituency building): বাংলাদেশের নির্বাচনে প্রতি প্রার্থীর জন্য একটি কনস্টিটিউয়েন্সি থাকতে হয় এবং পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হবার জন্যে দীর্ঘ সময় ধরে নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন কাজ পরিচালনা করতে হয়। যেমন স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি। কিন্তু সংরক্ষিত আসনের নারীদের জন্য যেহেতু নির্বাচনী এলাকা (territorial constituency) সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা থাকে না, ফলে তারা কোন কাজ করতে পারেন না। অর্থাৎ মূলত সশরীরে উপস্থিত থেকে শুধু সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব করা ছাড়া প্রকৃত অর্থে কোন ক্ষমতায়ন এসব নারীদের হয় না।

চ) সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধিত্ব (Representation of minority parties): সবশেষ যে বিতর্কটি এক্ষেত্রে রয়েছে সেটি হল, সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের মহিলারাই সংরক্ষিত আসনগুলোতে আসছেন, ফলে সংখ্যালঘু দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন এক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে গত নির্বাচনে এ বিষয়টি সংশোধন করা হয়েছে, সংশোধনীতে ৪৫ টি সংরক্ষিত আসন আনুপাতিক হারে সবগুলো দলের মাঝে বন্টন করার বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

জাতীয় সংসদ পর্যায়ে সংরক্ষিত নারী আসনের মূল সমস্যা বা বিতর্কগুলো পরোক্ষ নির্বাচন সংক্রান্ত হলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে পরোক্ষ নির্বাচনই এক্ষেত্রে একমাত্র সমস্যা কিনা। কেননা স্থানীয় সরকার পর্যায়ে মেয়েদেরকে সরাসরি নির্বাচনেই আনা হচ্ছে। কিন্তু সেখানেও রয়ে গেছে অনেক সমস্যা। এক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো মূলত রয়েছে সেগুলো হল –

ক) দ্বৈত প্রতিনিধিত্ব (Double representation in geographical constituency): স্থানীয় পর্যায়ে সংরক্ষিত কোটায় নির্বাচিত নারীদের জন্য নির্দিষ্ট ওয়ার্ড বরাদ্দ থাকে না। প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন করে নির্বাচিত পুরুষ প্রতিনিধি থাকেন। আর নারী প্রতিনিধিদেরকে ৩টি করে ওয়ার্ড দেয়া হয়, যেখানে ইতোপূর্বে ৩ জন পুরুষ প্রতিনিধি রয়েছেন। ফলে সেখানে একটি দ্বৈত প্রতিনিধিত্বের ব্যাপার ঘটে, যা নানা রাজনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারী প্রতিনিধিদের প্রকৃত অংশগ্রহণে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

খ) সুস্পষ্ট কর্ম-পরিধির অনুপস্থিতি (Absence of clear Terms of Reference): অপর যে বিষয়টি সমস্যার প্রকৃতিকে আরও জটিল করে তুলছে তা হল স্থানীয় এসব নারী প্রতিনিধিদের পরিষ্কারভাবে কোন টার্মস অফ রেফারেন্স বা কর্মপরিধি নেই। এ কারণে এসব নারী প্রতিনিধিরা মূলত ক্ষমতাহীন হয়ে রয়েছেন। তাদেরকে সভাগুলোতে ডাকা হয় না, সিদ্ধান্তগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় না, ভিজিএফ কার্ড বা অন্যান্য উন্নয়ন তহবিল ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয় না।

গ) প্রান্তিকীকরণ (Marginalization): এসব কারণে স্থানীয় এসব নারী প্রতিনিধিরা ক্ষমতায়িত না হয়ে বরং ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ছেন। এবং অনেকটা জেনেশুনেই তাদেরকে এভাবে প্রান্তিকীকরণ করা হচ্ছে।

ঘ) প্রক্সি নারী প্রতিনিধির নির্বাচন (Election of proxy women): আরেকটি যে ঘটনা বাংলাদেশে এমনকি ভারতেও ঘটে থাকে তা হল প্রক্সি নারী প্রতিনিধি নির্বাচন। এক্ষেত্রে যা ঘটে তা হল স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি বা সদস্যগণ তাদের স্ত্রী বা ঘনিষ্ঠ নারী আত্মীয়দের প্রক্সি হিসেবে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে নির্বাচিত করে আনেন, যাদের পরবর্তীতে মূলত তারাই নিয়ন্ত্রণ করেন। ভারতে এ ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ করে ড. *জাহান* বলেন, একজন পুরুষ নিজে নির্বাচিত হয়ে যেখানে একটি পঞ্চায়েতকে দখলে রাখতে পারতেন, সেখানে সংরক্ষিত আসনের বদৌলতে নারী নিকটাত্মীয়দের বিভিন্ন জায়গায় বসিয়ে তিনি এখন তিনটি পঞ্চায়েতের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছেন। তবে ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে এসব প্রক্সি মহিলারাও নির্দিষ্ট কিছু সময় পর যথেষ্ট ক্ষমতায়িত বা দক্ষ হয়ে উঠেন। অতএব এইসব সমস্যা থাকার অর্থ এই নয় যে কোটা পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজন নেই। বরং কীভাবে এসব সমস্যার কার্যকর সমাধান দেয়া যায়, সেটিই মূলত ভাববার বিষয়।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বায়নে নারী আন্দোলনকারীদের দাবি (Women's movement's demands for political representation)

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে নারী আন্দোলন সংগঠনগুলো কাজ করে আসছে। তাদের এ দীর্ঘ প্রয়াসে মূল যে দাবিগুলো উঠে এসেছে তা সংলাপে তুলে ধরেন ড. জাহান। তিনটি ভাগে তিনি এ দাবিগুলো বিন্যস্ত করেন – জাতীয় সংসদ পর্যায়, রাজনৈতিক দলগুলোর পর্যায় এবং স্থানীয় সরকার পর্যায়। এ কাজে তিনি মূলত মহিলা পরিষদের একটি প্রতিবেদন[২] থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন, যদিও মহিলা পরিষদ ছাড়াও আরও অনেক সংগঠন রয়েছে যাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান এক্ষেত্রে রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। দাবিগুলো নিম্নরূপ –

জাতীয় সংসদ পর্যায়

- *সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়ানো*: নারী আন্দোলনকারীদের প্রথম দাবিটি হচ্ছে জাতীয় সংসদে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা আরও বাড়ানো। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংখ্যা এজন্য প্রস্তাব করা হয়েছে, যেমন কখনো ৬৪, কখনো ১০০। মহিলা পরিষদ ২০০০ সালে যে বিলটি তৈরি করেছে সেখানে প্রস্তাব ছিল ১৫০ আসন সংখ্যার।
- *সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন*: সংরক্ষিত আসনগুলোতে বর্তমানে প্রচলিত পরোক্ষ নির্বাচনের পরিবর্তে সরাসরি নির্বাচনের দাবি তোলা হয়েছে।
- *কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ*: বর্তমানে প্রচলিত নির্বাচনী সংস্কৃতিতে টাকাপয়সা ও পেশীশক্তির যথেচ্ছা ব্যবহার দেখা যায়, যেগুলো নারীদের অংশগ্রহণে কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। এই বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচনী আইনগুলোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা এবং এগুলোর যথাযথ বাস্ত বায়ন নিশ্চিত করা।
- *নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা*: নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় আইন এবং উদ্যোগ গ্রহণের দাবি তোলা হয়েছে নারী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে।

---

[২] Bangladesh Mahila Parishad, *Movement Profiles of Bangladesh Mahila Parishad*, Report 1996-2002

- *সাংসদদের জেন্ডার সংবেদনশীল করা*: সাংসদদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে, কারণ জেন্ডার ইস্যুগুলোতে সাংসদদের সচেতনতা রাজনীতিতে নারীদের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার একটি অন্যতম প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত।

রাজনৈতিক দলগুলোর পর্যায়

- *সাধারণ আসনের প্রার্থী মনোনয়নে নারী কোটা*: বিগত প্রায় ২০ বছর ধরে নারী আন্দোলনকারীদের অন্যতম দাবি হল রাজনৈতিক দলগুলোর সাধারণ আসনের প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য কোটা প্রবর্তন করা এবং মেয়েদেরকে আরেকটু বেশি সংখ্যায় মনোনয়ন দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা।
- *সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারী কোটা*: রাজনৈতিক দলগুলোর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি নির্ধারণী পর্যায় রয়েছে সেখানে নারী সদস্যদের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর দাবি করা হচ্ছে।
- *অধিক নারী নিয়োগ ও দলের ভিতরে তাদের ক্রমান্বয়ে পদোন্নতি*: বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত মহিলাদের সুযোগ দেয় মেয়েদের ভোট দলের পক্ষে আনার জন্য। কিন্তু তারা যাতে দলের উপরের দিকের পদগুলোতে ক্রমশ: যেতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য কোন প্রশিক্ষণ বা কোন সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেয় না।
- *জেন্ডার সংবেদনশীলতা বাড়ানো*: রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্য, এদের কর্মকাণ্ড এবং দলীয় সংস্কৃতি জেন্ডার সংবেদনশীল নয়। যেমন দলীয় গুরুত্বপূর্ণ সভাগুলো অনেক রাতে ডাকা হয়। ফলে মহিলাদের পক্ষে এসব সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় না। অথচ নরডিক এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলো তাদের রাজনৈতিক দলগুলোতে অনেক নারীবান্ধব আইন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে এসব ক্ষেত্রে সেরকম কোন সংবেদনশীলতা নেই। দলীয় নিয়মাবলী সংক্রান্ত দলিলপত্রে খুব স্পষ্টভাবে এ ব্যাপারে কিছু বলা নেই বা তাদেরকে মনিটরিং করা হয় না। এদিকে আরেকটু যত্নশীল হতে হবে।
- *সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্বুদ্ধিকরণ*: রাজনৈতিক দলের নারী-পুরুষ সকল সদস্যদের জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শুধু মহিলারাই কেবল নারী বিষয়ে কথা বলবেন, পুরুষরা বলবেন না এটা না করে বরং দুইদলকেই এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে।

স্থানীয় সরকার পর্যায়

- *সুনির্দিষ্ট টার্মস অফ রেফারেন্স*: স্থানীয় সরকার পর্যায়ে যারা সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসছেন তাদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট টার্মস অফ রেফারেন্স থাকতে হবে।
- *নারী প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা বিধান*: মহিলারা যারা নির্বাচিত হয়ে আসছেন, অনেক সময়ই তারা সহিংসতার শিকার হচ্ছেন বা নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন। এসব নারী প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- *দলীয় সভা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ*: দলীয় জরুরী সভা গুলোতে নারী প্রতিনিধিদের অনেক সময় ডাকা হয় না। এসব ক্ষেত্রে নারীদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

- *উন্নয়ন তহবিল ব্যবহারের সুযোগ:* উন্নয়ন তহবিল যা দিয়ে কন্সটিটিউয়েন্সি গঠন ও উন্নয়ন করা হয় এবং তার ফলে একটি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়া হয়, নারী প্রতিনিধিদের সে তহবিল সমান ব্যবহারের সুযোগ থাকতে হবে।

২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচন: একটি সন্ধিক্ষণ (2008 election: A Watershed)

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে ২০০৮ সালের নির্বাচন নানাভাবেই একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। জেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে এ নির্বাচনটি যথেষ্টই ব্যাতিক্রমধর্মী উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, কেননা এ নির্বাচনেই প্রথমবারের মত অনেক মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসতে পেরেছেন। নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুকূল ও সহায়ক কর্মোদ্যোগ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। কারণ বিগত সময়ের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অর্থ-সম্পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রচণ্ড সহিংসতার ছড়াছড়ি একটি অরাজকতা ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল, যা নারীদের অংশগ্রহণে বরাবরই প্রতিকূল ভূমিকা রেখেছে। এবারই প্রথম মেয়েদের ক্ষেত্রে যেসব কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলোকে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তা নিরসনে নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মহিলাদের সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ পুরুষদের তুলনায় সীমিত ও বাঁধাসংকুল হওয়ায় নির্বাচনী ব্যয় মেটানো তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ও অনেকক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এবারের নির্বাচনে নির্বাচনী ব্যয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং মনিটর করা হয়েছে। একারণে একটি পরিচ্ছন্ন নির্বাচনী প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেক বেশি নারী এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন। এছাড়া সার্বিকভাবে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে অনেকগুলো নির্দেশনা এবার দেয়া হয়েছিল এবং এগুলো কঠোরভাবে মনিটর করা হয়েছে। যেমন মাস্তানি বা নানা ধরনের অপরাধের সাথে সম্পৃক্তরা এবার নির্বাচনী প্রার্থী হিসেবে আবেদন করতে পারেননি। রাজনৈতিক দলগুলোর উপরে সৎ, যোগ্য ও পরিচ্ছন্ন প্রার্থী মনোনয়ন দেবার ব্যাপারে চাপ ছিল। এ বিষয়গুলো মহিলাদের অনুকূলে বা পক্ষে গেছে। এছাড়া নির্বাচনী প্রচারণা প্রক্রিয়ায় সহিংসতার উপর একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল, ফলে নির্বাচনী প্রচারণা এবং ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া দুটোই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সংঘটিত হয়।

নির্বাচনী প্রচারণায় রাজনৈতিক দলগুলো নানারকম অঙ্গীকার করে থাকে। এরমধ্যে একমাত্র আওয়ামী লীগই ২০০৮ এর নির্বাচনী অঙ্গীকারে রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচিত সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ১০০ তে উন্নীত করবে। অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) এ সংক্রান্ত কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল না। তারা খুব সাধারণভাবে নারীদের অধিক হারে অংশগ্রহণের যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলেছেন, সুনির্দিষ্ট কোন পদক্ষেপের কথা বলেনি। আর জাতীয় পার্টি দলে এবং সরকারে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষিত পদের কথা বলেছেন, কিন্তু জাতীয় সংসদ সম্বন্ধে আলাদা করে কোন পদক্ষেপের উল্লেখ করেনি।

২০০৮ এর নির্বাচনী ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ৪৫ টি সংরক্ষিত আসনের পাশাপাশি জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন ১৯ জন অর্থাৎ ৫.৫ শতাংশ মহিলা। মন্ত্রী পরিষদ সদস্যপদে এসেছেন ৬ জন অর্থাৎ ১৪ শতাংশ মহিলা। আরও ব্যাতিক্রমধর্মী যেটা ঘটেছে তা হল – এবারই কিছু মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মত মহিলাদের দায়িত্বে দেয়া হয়েছে যেগুলো গতানুগতিকভাবে মহিলাদের দেওয়া হয় না। সচরাচর মহিলাদের শুধু মহিলা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে দেখা যেত। তবে এবার কৃষি, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে মহিলারা এসেছেন। এছাড়াও আওয়ামী লীগের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পার্টি কাউন্সিলে ঘোষিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রেসিডিয়াম সদস্যের মোট ১৫ জনের মধ্যে ৫ জন এবং সচিব হিসেবে নির্বাচিত ৩১ জনের মাঝে ৩ জন ছিলেন মহিলা।

এতসব গুরুত্বপূর্ণ অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে ড. *জাহান* প্রশ্ন তোলেন যে ২০০৮ এর এ নির্বাচন কী একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করবে, যার ফলে ক্রমশঃ পরবর্তিতে আরও ভালো কিছুর দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো, নাকি পূর্বের অবস্থায় আবার ফিরে যেতে হবে আমাদের? এটি অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয়, কেননা ১৯৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত উন্নতি হয়েছে খুবই ধীর গতিতে, বড় ধরনের কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। ২০০৮ এ এসে নানারকম অনুকূল শর্ত তৈরি হবার কারণে নারী অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু যদি আবার পূর্বতন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আমরা ফিরে যাই, তবে নারী প্রতিনিধিত্বে যেটুকু অর্জন আমাদের হয়েছে তা হয়তো ধরে রাখা সম্ভব হবে না। সুতরাং এ বিষয়টি অবশ্যই একটি গুরুত্ব নিয়ে ভেবে দেখার বিষয় বলে ড. *জাহান* মনে করেন।

বিশ্ব অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের শিক্ষণীয় (Lessons from global experiences for Bangladesh)

ড. জাহান রাজনীতিতে নারী প্রতিনিধিত্বে সমতা আনয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা সবিস্তারে আলোচনার পর তা থেকে বাংলাদেশের জন্য অনুকরণীয় ও শিক্ষণীয় কী রয়েছে তা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন, যেগুলো নিম্নরূপ –

- বিশ্বের নানা দেশের দৃষ্টান্ত থেকে এটি স্পষ্ট এবং অনস্বীকার্য যে খুব দ্রুত নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য কোটা একটি কার্যকরী উপায়। নেপালের উদাহরণ থেকে দেখা যায় যেখানে ১৯৯৭ সালে নেপালের জাতীয় সংসদে মাত্র ৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধি ছিল, সেখানে বর্তমানে এই হার ৩৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যার মূল কারণ হচ্ছে নারীদের জন্য নানারকম কোটার ব্যবহার।
- কোটাগুলোর মধ্যে নারীদের মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে রাজনৈতিক দলের কোটা। নরডিক দেশগুলো এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, এসব দেশের রাজনৈতিক দলগুলো পার্টি কোটার ভিত্তিতে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিতে কাজ করছে।
- নির্বাচনী পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট, যেটি আমাদের দেশে আছে তার তুলনায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে অধিক অনুকূল ও কার্যকর ভূমিকা রাখে। যেমন আমেরিকায় ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতি থাকায় সেখানে ১৯৯৬ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে সংসদে নারী সদস্য শতকরা ১২ থেকে মাত্র ১৭ তে পৌছেছে।
- শুধু কোটা করলেই নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে না, তা বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে আমরা যাচ্ছি কিনা তা পরিমাপের জন্য একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সচেতন মানসিকতা নিয়ে এসব পরিকল্পনার পুরো বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি মনিটর করতে হবে।
- কোটার মাধ্যমে অধিক নারীরা আসবেন ঠিকই, কিন্তু শুধু সংরক্ষিত আসনেই চিরকালের জন্য তারা যেন সীমাবদ্ধ না থাকেন। অর্থাৎ লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোটা পদ্ধতি নারীদের জন্য একটি ঘেটো বা গ্লাস সিলিং

না হয়ে যায়, যেখানে তারা আটকে যান। যেমন বাংলাদেশে প্রশাসনে ১০ শতাংশ হারে নারীদের জন্য যে কোটা রাখা হয়েছে, সেখানে মেয়েরা এ ১০ শতাংশ এর উপরে আর যেতে পারছেন না। এটি তাদের জন্য একটি গ্লাস সিলিং এর মত হয়ে গেছে। কিংবা নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১০০ তে উন্নীত হলে পরে নারীরা যদি শুধু এসব সংরক্ষিত আসনেই নির্বাচিত হন, সাধারণ আসনে নির্বাচন না করেন, সেটি কখনোই কাঙ্খিত নয়। এরকম পরিস্থিতি অবশ্যই এড়িয়ে চলা উচিত। অতএব এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

- একমাত্র কোটা দিয়ে নারীদের জন্য কোন নিরবচ্ছিন্ন, টেকসই অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয় না। সমতা অর্জনের লক্ষ্যে কোটার পাশাপশি নারী অংশগ্রহণে যেসব কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো দূর করার জন্য নানারকম উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন, যেটি নরডিক দেশের উদাহরণ থেকে দেখা যায়। নরডিক দেশগুলো প্রথমেই মেয়েদের কোটা করেনি। মেয়েদের অংশগ্রহণ যখন শতকরা ২০ থেকে ২৫ এ পৌঁছে গেছে, তখন তারা কোটার প্রবর্তন করেছেন। ২০ থেকে ২৫ শতাংশ মেয়েদের অংশগ্রহণ থাকা মানে এরই মধ্যে তাদের নিজস্ব কিছু শক্তি এবং ক্ষমতা সঞ্চিত হয়েছে। এটিকে আরও সহায়তা প্রদানের জন্য তখন কোটা করা হয় যাতে এটিকে তারা চালিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু যেখানে মেয়েরা অতটা ক্ষমতায়িত হননি, শুধুমাত্র কোটা করে দিলে সেখানে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তা ধরে রাখা খুবই মুশকিল।
- সবশেষ শিক্ষণীয় বিষয়টি হল, যেসব দেশে নারী প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে, সেসব দেশেই নারী আন্দোলন কোন না কোনভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এক্ষেত্রে রেখেছে।

নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে বাংলাদেশের করণীয়

সবশেষে ড. *জাহান* বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে করণীয় কিছু প্রস্তাবনা বা সুপারিশমালা পেশ করেন, যেগুলো নিম্নরূপ –

স্বল্প মেয়াদে করণীয়:

- বর্তমান সংসদের ৪৫টি সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত নারী সাংসদদের জন্য দ্রুত সুস্পষ্ট কর্মপরিধি (Terms of Reference) চিহ্নিত করতে হবে, যাতে করে তারা সত্যিই কাজ করতে পারেন। সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা বা কন্সটিটিউয়েন্সি না থাকায় তারা প্রকৃত অর্থে বর্তমানে কাজ করতে পারছেন না। এ বিষয়টি দ্রুত মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।
- সাধারণ আসনে নির্বাচিত সাংসদদের মত সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সাংসদদেরও সরকারী উন্নয়ন তহবিল (public development funds) ব্যবহার করার এখতিয়ার থাকতে হবে।
- রাজনৈতিক দলগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় (decision making bodies) নারীদের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব আরও বাড়াতে হবে।
- নারী বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে আরও জোরদার ও শক্তিশালী করতে হবে যাতে তারা নারীদের জন্য নানা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তাদের দাবিগুলো তুলে ধরতে পারেন। এক্ষেত্রে নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কী, এরমধ্যে কোন্‌গুলো নিয়ে তারা কাজ করবেন এবং জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরবেন, এখন পর্যন্ত যেসব উন্নয়নমূলক তহবিল আছে সেগুলো কীভাবে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, অন্যান্য যেসব মহিলা সংগঠন আছে

তাদের সাথে মিলে কীভাবে জোটভুক্ত হয়ে কাজ করা যায়, এসব বিষয়ে সংসদীয় এই কমিটি আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

- সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ১০০ সংরক্ষিত আসনে নারীদের নির্বাচিত করার যে নির্বাচনী অঙ্গীকার ক্ষমতাসীন দল করেছে তার বাস্তবায়নে জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপন করতে হবে।

- শুধু বিল উত্থাপন করলেই চলবে না, এর পাশাপাশি অনেকগুলো বিরাজমান সমস্যার কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। তা নাহলে নারীদের জন্য ১০০ সংরক্ষিত আসনের বিষয়টি প্রকৃত অর্থে বাস্তবায়িত হবে না। যেমন, প্রস্তাবিত ১০০ সংরক্ষিত আসন বন্টনের ব্যাপারে একধরনের সমঝোতায় সকলকে পৌঁছুতে হবে। এছাড়া এ সংরক্ষিত আসনগুলোর বিপরীতে নির্বাচনী এলাকার সীমারেখা (Constituency demarcation) কীভাবে নির্ধারিত হবে, এ আসনগুলোর জন্য ব্যালট কাঠামো (Ballot structure) কী হবে এসবও ভেবে দেখতে হবে। নারী আন্দোলনকারীরা একটি ব্যালট কাঠামো প্রস্তাব করেছেন যেখানে প্রত্যেক ভোটারের দুটো ভোট থাকবে – একটি সাধারণ আসনের জন্য, আরেকটি সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য। তবে প্রস্তাবিত এ কাঠামো সম্পর্কে এখনো অনেকের দ্বিমত রয়েছে এবং এটি বিশদ আলোচনার মাধ্যমেই সমাধা হওয়া দরকার।

<u>মধ্য মেয়াদে করণীয়:</u>

- সাধারণ এবং সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত সম্ভাব্য যোগ্য নারী প্রার্থীদের একটি দল (pool) তৈরি করতে হবে যারা ভালোভাবে তাদের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন। যেহেতু ৫ বছর পরেই আরেকটি নির্বাচন হবে, এখন থেকেই এ লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে।

- নারীদের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলভাবে টিকে থাকার জন্য প্রচুর তহবিল দরকার যা আগে থেকেই জোগাড় করা শুরু করা দরকার। কারা এ তহবিল জোগাড় করবেন, কীভাবে করবেন, এ সবই ভাবা দরকার এখন থেকেই।

- নারী প্রার্থীদের জন্য একটি সাপোর্ট নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে যাতে করে তুলনামূলকভাবে শক্ত অবস্থানে থাকা পুরুষ প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করার মত একটি পর্যায়ে তারা পৌঁছুতে পারেন। নারী প্রতিনিধিত্বে এগিয়ে যাওয়া দেশগুলো এই সাপোর্ট নেটওয়ার্ক অনেক আগে থেকেই গড়তে থাকে। এক্ষেত্রে আরও ভাবতে হবে যে কারা এই সাপোর্ট নেটওয়ার্ক তৈরিতে কাজ করবেন – রাজনৈতিক দল, না নারী আন্দোলন সংগঠন, নাকি অন্য কেউ?

- আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যেসব নারী সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত, আর যারা সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হয়ে নানাভাবে নারী আন্দোলনে ভূমিকা রাখছেন – এ দুই দলের নারীদের মাঝে একটি অর্থবহ যোগাযোগ স্থাপন করা ও নানা বিষয়ে মতবিনিময় অব্যাহত রাখা। আমাদের দেশে এ দুটি দলই খুব বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের মাঝে খুব অর্থবহ কোন যোগসূত্র নেই। যার ফলে দু'দলেরই একটি সাধারণ লক্ষ্য থাকলেও, সে লক্ষ্য অর্জনে একটি দল আরেকটি দলের পরিপূরক ভূমিকা নিতে পারছেন না। অথচ নরডিক বা অন্যান্য যেসব দেশে মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব খুব তাড়াতাড়ি এগিয়েছে, সেসব দেশে এদুটি দল পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। *ড. জাহান* বিশেষ করে এ দিকটিতে যে আমাদের দেশে ঘাটতি রয়ে গেছে তা উল্লেখ করে বলেন, কারোর সমালোচনা করা মানে এই নয় যে তিনি শত্রু, এবং যতদিন না এ মানসিকতা আমরা পরিহার করতে

পারবো, ততদিন আমাদের এ জোট গঠনটি ঠিকভাবে হয়ে উঠবে না। সুতরাং প্রত্যেককে তার নিজস্ব অবস্থান থেকে এ যোগসূত্রটি বজায় রাখতে উদ্যোগী হতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

<u>দীর্ঘ মেয়াদে করণীয়ঃ</u>

- সুনির্দিষ্টভাবে নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখে এমন কিছু এজেন্ডা সনাক্ত করা একটি অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ। কিন্তু নারী বিষয়ক এজেন্ডা নির্ধারণে তেমন কোন কাজ বাংলাদেশে হয়নি। ফলে নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বেশিরভাগ কাজ লক্ষ্যহীন বা স্বল্পমেয়াদে উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবেদিত। সত্যিকার অর্থে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীদের সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের কাজ খুব কমই হয়েছে। এসব নারী ইস্যু হল এমন ইস্যু যেগুলো সম্পর্কে সকল নারীর একটি সম্মিলিত অবস্থান রয়েছে এবং যা সকল নারীকেই কোন না কোনভাবে প্রভাবিত করে। এগুলো আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা মহিলা পরিষদের এজেন্ডা নয়, এগুলো সমাজের সকল স্তরের সকল নারীর এজেন্ডা। যেমন গর্ভপাত ইস্যু, আমেরিকায় গর্ভপাত সংক্রান্ত ইস্যুতে অনেক কাজ হয়েছে। এমন কমপক্ষে ১০টি মূল নারী ইস্যু আমাদের সনাক্ত করতে হবে, যেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।
- যেহেতু মোট ভোটারদের ৫০ শতাংশ হচ্ছেন নারী, নারীদের ভোটগুলো যাতে অন্তত নারীদের পক্ষে পড়ে সে অনুযায়ী নারী ভোট প্রভাবিত করতে হবে। এবং সে লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট এজেন্ডাভিত্তিক কাজ করতে হবে, যার নিরিখে নারী ভোটাররা মহিলা এবং পুরুষ উভয় প্রার্থীকে বিচার করে তাদের ভোটটি দেবেন। এটি করা গেলে নারীদের প্রতিনিধিত্ব দ্রুত বাড়ানো সম্ভব হবে।

সবাইকে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আলেচিত ও প্রস্তাবিত বিষয়গুলো বিশ্লেষণের আহবান জানিয়ে ড. *রওনক জাহান* এ পর্যায়ে তাঁর উপস্থাপনা শেষ করেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান ড. জাহানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাঁর বক্তব্য থেকে অনেক তথ্য ও সত্য বেরিয়ে এসেছে যা থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন ড. জাহানের এই তথ্যসমৃদ্ধ উপস্থাপনা থেকে একটি কার্যকর আলোচনার সূত্রপাত ঘটবে। মুক্ত আলোচনার জন্য সংলাপ উন্মুক্ত করার পূর্বে তিনি 'নির্ধারিত আলোচকের বক্তব্য' পর্বে 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' এর সভাপতি আয়শা খানমকে আলোচ্য বিষয়ে কিছু বলার জন্য আহ্বান করেন।

নির্ধারিত আলোচকের বক্তব্য

উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে *আয়শা খানম* 'সুশীল সমাজের থিংকট্যাঙ্ক' হিসেবে সিপিডিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের ইস্যুতে একটি সময়োপযোগী সংলাপ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করবার জন্য। ড. রওনক জাহানকে একজন ধীমান গবেষক হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন – বৈশ্বিক, দক্ষিণ এশীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বায়নের একটি বিশদ বিবরণ তাঁর উপস্থাপনায় উঠে এসেছে। বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠনের তথ্য-উপাত্ত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে ড. জাহান যে বিশ্লেষণটি তুলে ধরেছেন তা এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের আরও ভাবনার

খোরাক যোগাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে না গিয়ে *আয়শা খানম* মূলতঃ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেন।

আয়শা খানম প্রথমত নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাগত বনাম গুণগত দিকের ভারসাম্যের বিষয়টিতে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে মন্ত্রী পরিষদ বা সংসদে শুধু নারীর সংখ্যা বাড়ানোই উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য হল সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থা বদলাতে সহায়তা করবে এমন এজেন্ডার অধকতর সুযোগ সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে সংখ্যায় যেমন নারীদের বাড়াতে হবে, তেমনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের সত্যিকারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কেননা প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে সংরক্ষিত আসনের নারীরা রাজনীতিতে কোন অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছেন না। পরিস্থিতি এতটাই নাজুক যে তাদের অফিস নেই, সার্কুলার পান না, এমন কি ডিসি অফিসে গেলে জানতে চাওয়া হয় সরাসরি না সংরক্ষিত আসনের সাংসদ এবং সে অনুযায়ী তাঁর বক্তব্যে গুরুত্ব দেয়া হয়। সুতরাং সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হবার গুণগত দিকটি নিশ্চিত করা আশু জরুরী বলে তিনি মনে করেন।

তবে *আয়শা খানম* এক্ষেত্রে অনেকগুলো অগ্রগতি, অর্জন ও সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, ধীরে হলেও একটি গুণগত পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়ে উঠছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। এবারই বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম জেন্ডার বিষয়ক এজেন্ডা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং প্রকাশ্য একটি অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে সমগ্র জাতির কাছে। এ অর্জনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের আন্দোলন, সংগ্রাম, পরিশ্রম এবং অনেক ব্যক্তি ও সংগঠনের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অনেক অবদান। আওয়ামী লীগসহ মহাজোটের ২৩ দফা এ কর্মসূচী অন্যান্য দলের উপরও একটা অলিখিত চাপ সৃষ্টি করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সুতরাং এটি একটি বিশাল অগ্রগতি, যা আরও গুণগত পরিবর্তনের দিকে পুরো রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আয়শা খানম মনে করেন দুটি শর্ত পূরণ হবার ফলেই গুণগত এ পরিবর্তনটি নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠছে। এ দুটি বিষয়ের অভাব নারী আন্দোলনের পক্ষ থেকে গত দুই দশকে বরাবরই তুলে ধরা হয়েছে। তার মাঝে একটি হল সাধারণ মেয়েরা এখন অনেকক্ষেত্রেই অগ্রসর এবং অনেক বেশি প্রস্তুত বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিশেষত ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা, গার্মেন্টস এবং আরও অনেক ঝুঁকিপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের আজ অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু যে অভাবটি প্রকটভাবে উপলব্ধি হচ্ছিল, সেটি হল – রাজনৈতিক সদিচ্ছা। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সমর্থনের অভাবে নানাভাবে নারী আন্দোলন বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছিল এবং নারী প্রতিনিধিত্ব ত্বরান্বিত করার বিষয়টি হোঁচট খাচ্ছিল। কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এবং তার নেত্রীর একটি শক্তিশালী সমর্থন এবার গুণগত দিক থেকে বড় একটি পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে ভীষণভাবে কাজ করেছে বলে তিনি মনে করেন।

নির্বাচনী পদ্ধতির সংস্কারের ক্ষেত্রেও অনেক অগ্রগতি হয়েছে। নারী আন্দোলন এ বিষয়ে যেসব শর্ত নির্বাচন কমিশনের কাছে তুলে ধরেছিল, কমিশন সে শর্তগুলো পূরণ করেছে। ৪৭০ জন মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যাপারটি এক্ষেত্রে একটি বড় উদাহরণ।

নারী বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠনকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অগ্রগতি বলে আখ্যায়িত করেন আয়শা খানম। শুধু নারী ইস্যুতে একটি সংসদীয় কমিটি, যা একজন নারীর নেতৃত্বেই কাজ করবে এরকম আগে কখনও ছিল না। তবে এটিকে কার্যকর রাখার দায়িত্বে যাঁরা আছেন এবং বাইরে থেকে যাঁরা এ প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করছেন, তাদের সকলের সম্মিলিত উদ্যোগের উপর এ কমিটির সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

উন্নত দেশগুলো যারা শিক্ষা-দীক্ষা এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক এগিয়ে, তাদের যেখানে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে জেন্ডার সমতা অর্জন করতে প্রায় তিন দশক লেগেছে; সেখানে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বঞ্চনা ও অনগ্রসরতার পরেও বাংলাদেশের অগ্রগতি অনেক আশাব্যঞ্জক বলে মনে করেন *আয়শা খানম*। সুতরাং ড. জাহান যে প্রশ্ন রেখেছেন যে ২০০৮ সালের নির্বাচনে যে গুণগত উত্তরণ ঘটেছে সেটি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কি একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করবে এবং তা এগিয়ে যাবে, নাকি তা এখানেই শেষ হবে এবং আমরা আবার পুরনো রীতিতে ফিরে যাবো? আয়শা খানম মনে করেন, নিশ্চয়ই উত্থান-পতন থাকবে, তবে এটি অগ্রসর হবে। ইতিহাস তাই বলে। তবে এ ধারাকে ধরে রাখতে হলে একটি ধারাবাহিক ফলো-আপ দরকার। আর এ ফলো-আপ শুধু নারী আন্দোলনের দিক থেকে করলে হবে না। এখানে প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বের একটি বড় ভূমিকা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ড. জাহান সুশীল সমাজের মুভমেন্ট বা নারী আন্দোলনের সাথে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্পর্কের দূরত্বের যে প্রসঙ্গটি তুলেছেন সে বিষয়ে আয়শা খানম বলেন, এ বিষয়ে একধরনের মানসিক প্রতিবন্ধকতা কাজ করে এ দুটি গোষ্ঠীর মাঝে। এটি দূর করা দরকার।

নারী প্রতিনিধিত্ব কেন, কীভাবে হবে, কী ধরনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হবে – আলোচিত এসব প্রসঙ্গে আয়শা খানম বলেন, ঐতিহাসিকভাবেই নারীরা যেহেতু বৈষম্যের শিকার, সেহেতু একটি সম-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করার জন্যই ইতিবাচক কিছু পদক্ষেপ নারীদের পক্ষে নিতে হবে। এবং নারীর সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এসব পদক্ষেপের লক্ষ্য, আর বৈশ্বিক অভিজ্ঞতাটি এক্ষেত্রে আমাদের দেশের বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে আমাদের নিজস্ব অবস্থান বিচার করার হাতিয়ার হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি। তবে বিশেষ এ সুযোগের ব্যাপারে *আয়শা খানম* তার অবস্থান স্পষ্ট করেন এই বলে যে – নারীদের সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ এসব ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু তা সীমাহীনভাবে অনাদিকালের জন্য নয়। যতদিন পর্যন্ত এ লক্ষ্য অর্জনের বাস্তব ক্ষেত্রটি তৈরি না হয় ততদিন পর্যন্ত, হয়তো দুই-তিনটি সংসদীয় মেয়াদে এটি রাখা যেতে পারে।

ইতিবাচক নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে অংশগ্রহণের সংখ্যাগত দিকটি নিশ্চিত হবার পর মনোযোগ দিতে হবে নির্বাচনী পদ্ধতি ও সংসদীয় পদ্ধতির কাজ করার ধরন, সংসদীয় কমিটিগুলোর কাজের আওতা, বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ করার ধরন ইত্যাদির উপর। এসব প্রতিটি ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ কী ভূমিকা নারীরা নিতে পারছেন সেটি হল মূল বিবেচনার বিষয়। শুধু সংখ্যায় নারীদের বাড়িয়ে লাভ নেই, যদি না সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের প্রকৃত অংশগ্রহণ না থাকে। এবং যে ভয়েসটা রয়েছে তা কীভাবে উচ্চারিত হচ্ছে, তার উপরও নির্ভর করবে নারীরা কতটুকু এবং কীভাবে অংশগ্রহণ করছেন রাজনীতিতে। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে

আয়শা খানম দেখেছেন সরাসরি নির্বাচিত এবং পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ক্ষমতায় খুব বেশি পার্থক্য নেই। তাই সংসদের অভ্যন্তরে নারীদের অবস্থান আরও উন্নততর করা প্রয়োজন। আর তা করতে হলে বাইরে থেকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

আয়শা খানম আরও বলেন, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন শুধু সংসদ দিয়ে হবে না। সত্যিকারের গণতন্ত্র আসতে হবে তৃণমূল পর্যায় থেকে। এখানে যেটি করণীয় সেটি হল সব দলের সাংসদ, সংসদীয় কমিটির সভাপতি সকলে মিলে একটি বাস্তবসম্মত কর্মকৌশল নির্ধারণ করা এবং সকলে মিলে তা বাস্তব রূপদান করায় কাজ করা। এ বিষয়টি একদিনে যেমন হবে না, তেমনি শুধু অসীম আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেলেই চলবে না। এক্ষেত্রে রাজনীতির বাস্তবতাটি বিবেচনায় রাখতে হবে। কেননা রাজনৈতিক দলের সদস্যদের আন্তঃদলীয় একটা নিয়মের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয়। এটি তারা ব্যক্তিগতভাবে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। শুধু দল নয়, সংসদের ভেতরেও নারী ইস্যুতে আওয়ামী লীগ-বিএনপি বিভাজন ভুলে গিয়ে অধিকার আদায়ের দাবিতে দলীয় নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করা – এটিও হচ্ছে না। দলীয় বিভাজন ভুলে গিয়ে নারী অধিকারের প্রশ্নে এক হতে পারলেই অনেকখানি অগ্রগতি সম্ভব।

নারীদের নিজস্ব এজেন্ডা বিষয়ে *আয়শা খানম* বলেন, নারী আন্দোলনের পক্ষ থেকে কিছু এজেন্ডা তৈরি করা হয়েছে। যেমন প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের বিষয়টি বিবেচনা করা, অর্থাৎ প্রার্থী সম্পর্কে যদি নির্যাতনকারী হিসেবে অভিযোগ থাকে, তাকে মনোনয়ন না দেয়া। তবে যেসব এজেন্ডা তৈরি আছে, সেগুলোকে আরও সুনির্দিষ্ট রূপ দিতে হবে। এতদসংক্রান্ত একটি খসড়া বিলও নারী আন্দোলনের পক্ষ থেকে তৈরি করা হয়েছে, এটিকেও আরও পরিমার্জন করতে হবে। কমিটি যদি বিলটি ভালোভাবে পর্যালোচনা করে, সকলের সাথে আলোচনা করে মতামত-পরামর্শ নিয়ে এটিকে চূড়ান্ত করে যদি সংসদে উত্থাপন করে, তবে আশা করা যায় আগামী নির্বাচনের আগে নারীদের নির্বাচনে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রটির একটি শক্ত ভিত তৈরী হবে। নারী আন্দোলন এ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু এ বিল পাশ করার ব্যাপারে ঠিক কী ধরনের কৌশল অনুসরণ করা উচিত, কোন কর্মসূচী ও পদ্ধতির মাধ্যমে এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় – মানব বন্ধন, না সাংবাদিক সম্মেলন, নাকি ঘরে ঘরে যেয়ে সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন করা, এ বিষয়গুলো জানা দরকার। সুতরাং কৌশল, ইচ্ছা, বাস্ত বতা এসবই খুব সুস্পষ্ট। এখন যা দরকার তা হল, যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে এবং যে আশার সঞ্চার হয়েছে সেটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; আর যে জটিলতাগুলো রয়েছে, সেগুলো মোকাবেলা করার একটি সম্মিলিত উদ্যোগ নারী আন্দোলন ও রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে নেয়া। বিশেষ করে নারী সাংসদদের সাথে বিষয়টি সমন্বয় হওয়া দরকার। তা নাহলে নারীরা শুধু সংখ্যায় বাড়বেন, তাঁদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন হবে না।

মুক্ত আলোচনা

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ শুধু নারীদের বিষয় নয়, এটি একটি জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যা জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে – এ বিষয়টিতে আলোকপাত করে *অধ্যাপক রেহমান সোবহান* মুক্ত আলোচনার জন্য সংলাপ উন্মুক্ত করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা এবং নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিশেষ সমস্যাগুলোর উপর স্ব স্ব বিশ্লেষণ তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন ইস্যুতে ভিন্ন ভিন্ন

দৃষ্টীকোণ থেকে তাদের বক্তব্য ও অবস্থান ব্যক্ত করেন। সংলাপ-সঞ্চালক *অধ্যাপক রেহমান সোবহান* উপস্থিত সকলকে খুব তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়ে তাদের দীর্ঘ কয়েক দশকের অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহারিক ও প্রাসঙ্গিক সমাধানে মনোনিবেশ করতে অনুরোধ করেন। বর্তমানে বিরাজমান সমস্যাগুলোর উত্তরণে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর পরবর্তী করণীয় কী, কৌশলগত কী ধরনের অবস্থান এবং আইনি পরিকাঠামোতে কি ধরণের পরিবর্তন করা দরকার – এসব নানা বিষয় সংলাপে আলোচিত হয়। প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশে সংলাপে বক্তাদের আলোচনার মূল বক্তব্য ইস্যুভিত্তিকভাবে দেয়া হল।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণে সংখ্যাগত ও গুণগত দিকের ভারসাম্য

রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে সংখ্যাগত দিকটি বিবেচনা করার পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণের গুণগত দিকটি নিশ্চিত করার বিষয়টি সংলাপে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। অংশগ্রহণের সংখ্যা ও গুণগত বিবেচনার এ বিতর্কে অনেকেই মনে করেন বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রথমে নারীদের বেশি সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে। 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' এর সভাপতি *আয়শা খানম*, 'কর্মজীবী নারী'র সভাপতি *শিরিন আখতার* তাঁরা প্রাথমিকভাবে সংখ্যা বাড়ানোর দিকেই গুরুত্ব দেন। 'তথ্য কমিশন' এর কমিশনার *ড. সাদেকা হালিম*, 'সুজন' এর সদস্য সচিব ড. *বদিউল আলম মজুমদার*, সাংসদ *সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া* ও *নীলুফার চৌধুরী মণি* – তাঁরা সকলেও একমত হন যে রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। কিন্তু তাঁরা এ অংশগ্রহণের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং সেখানেই অগ্রাধিকার দেবার কথা বলেন। তাঁরা বলেন শুধু সংখ্যায় বাড়ালেই হবে না, এটি অর্থবহ হতে হবে। বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নারী আসন ১০০ তে উন্নীত করার ঘোষণাকে অভিনন্দন জানিয়ে *ড. বদিউল আলম মজুমদার* বলেন, এর মাধ্যমে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়বে নিঃসন্দেহে। কিন্তু কী পদ্ধতিতে এটি করা হবে তার উপর নির্ভর করবে এটি কতটুকু অর্থবহ হবে। সুতরাং সংখ্যার পাশাপাশি গুণগত দিকটি সবসময়ই বিবেচ্য বিষয় হিসেবে থাকা উচিত বলে সংলাপে বক্তারা জোর দেন।

ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে কোটা

ঐতিহাসিকভাবে নারী যে বৈষম্যের শিকার, এবং তার কারণে নারীর যে অধস্তন অবস্থা – সেটিকে অন্তত সাময়িকভাবে মোকাবেলা করার জন্যে কোটার প্রয়োজন আছে বলে সংলাপে উপস্থিত অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন। তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন, যেহেতু নারীরা নানাকারণে পিছিয়ে রয়েছেন, সেই বিবেচনায় নারীদের পক্ষে ইতিবাচক বৈষম্য (positive discrimination) হিসেবে কোটার প্রবর্তন যুক্তিসঙ্গত। এটিতে দ্বিমত প্রকাশ করার কোন অবকাশ নেই বলেই মনে করেন 'কর্মজীবী নারী'র সভাপতি *শিরিন আখতার*। তিনি নরডিক দেশগুলোতে কোটার ফলে নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, সে বিষয়গুলো আরও বিশদভাবে জানা এবং আমাদের দেশে এর প্রয়োগ ঘটানোর ব্যাপারে আলোচনার উপর জোর দেন। এছাড়াও তিনি বিশেষ করে রাজনৈতিক দলে নারীদের কোটা বাড়ানো এবং আরও অধিক প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন যাতে করে রাজনৈতিক দলে নারীর প্রতিনিধিত্বটা বাড়ানো যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক *ড. জারিনা রহমান খান*ও এ প্রসঙ্গে একমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আফ্রিকার কয়েকটি দেশে কোটা প্রবর্তনের দাবি তোলা

হয়েছে। পাকিস্তানে কোটার বিরুদ্ধে কথা উঠেছিল যে কোটার মাধ্যমে শুধু সমাজের অভিজাত বা ক্ষমতাবান স্তরের নারীরাই প্রাধান্য পাচ্ছেন। কিন্তু বাংলাদেশ এবং ভারতের স্থানীয় সরকার পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন দেখার পরে তারা এ বিতর্কে আর যেতে পারছেন না। সুতরাং রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর ক্ষমতায়নে কোটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কারোর কোন দ্বিমত রাখার অবকাশ নেই। তবে আয়শা খানমের মত আরও অনেকে যে বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করেন তা হল, কোটার এই বিশেষ সুযোগ অনন্তকালের জন্য নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই রাখা উচিত। অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত সম অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি ক্ষেত্র তৈরি না হচ্ছে ততদিন পর্যন্তই এটিকে যৌক্তিক বলে মনে করেন তাঁরা। সেইসাথে বাস্তবায়ন পর্যায়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় এর সঙ্গতিবিধানের উপর জোর দেন *ড. জারিনা রহমান খান*।

তথ্য কমিশনের কমিশনার *ড. সাদেকা হালিম* নারীর পক্ষে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে কোটা নীতিকে সমর্থন করলেও একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি মনে করেন, অনেক ক্ষেত্রে কোটার এ সুযোগ বরং নারীর প্রচলিত অধস্তন অবস্থানকে আরও দুর্বল করে। কেননা উন্নয়নের মূলধারা থেকে নারীকে আলাদা রেখে শুধু বাহ্যিকভাবে কোটার ব্যবস্থা করে নারীর সত্যিকারের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ সম্ভব নয় বলেই তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তাই এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে আরও সতর্ক মনোভাবের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি। রাজনীতিতে কোটার মাধ্যমে নারীদের সংখ্যা বাড়ানোর ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা হ্রাস করার ক্ষেত্রে গুণগত কী কী প্রভাব পড়ছে তা খতিয়ে দেখার উপরও জোর দেন তিনি। কারণ ২০০৮ এর নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের সংখ্যা এবং গুণগত পরিবর্তন এলেও, দোর্‌রা মারার ঘটনা বাংলাদেশে বন্ধ হয়নি। সুতরাং কোটার মত ইতিবাচক বৈষম্যমূলক পদক্ষেপগুলোর সার্বিক প্রভাবের চিত্র তুলে ধরার দাবি জানান তিনি।

নারীদের এজেন্ডা

নারীদের নিজস্ব বিভিন্ন যেসব সমস্যা রয়েছে সেসব এজেন্ডাগুলো নির্ধারণ করা এবং দলমত ও অবস্থান নির্বিশেষে রাজনীতিবিদ, সাংসদ, নারী অন্দোলনকারী, গবেষক, পেশাজীবী, উন্নয়ন কর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি – সকলেরই এসব এজেন্ডা নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাবার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সংলাপে আলোচিত হয়।

'নিজেরা করি'র সমন্বয়ক *খুশি কবীর* নারীর মূল এজেন্ডাগুলো নির্ধারণে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান। সমাজের সব স্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করা, মত বিনিময় করা এবং এক্ষেত্রে সকলেরই একটি ভূমিকা রাখা জরুরী বলে মনে করেন তিনি। বিশেষত দোর্‌রা মারার ঘটনা ইদানিং যে হারে বাড়ছে তাতে আশংকা প্রকাশ করে তিনি সকলকে এক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট ভূমিকা নেয়ার অনুরোধ জানান। নারী বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটিরও এখানে একটি শক্ত ভূমিকা থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

'ক্যাম্পে'র পরিচালক এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা *রাশেদা কে. চৌধুরীও* অন্তত নারীর ইস্যুতে দলীয় এজেন্ডার উর্ধ্বে উঠে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে প্রশ্ন এসেছে যে নারী ইস্যুতে মূলত কারা কাজ করবেন – রাজনৈতিক দলগুলো, নাকি নারী অন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা? এক্ষেত্রে দু'দলেরই ভূমিকা রাখা এবং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

'উইমেন ফর উইমেন' এর সদস্য *ড. মাহমুদা ইসলাম*ও রাজনৈতিক দলগুলোকে দলীয় মতভেদ ভুলে নারী এজেন্ডা বিষয়ে একযোগে কাজ করার উপর জোর দেন। এক্ষেত্রে তিনি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যেকোন বিষয়কে রাজনৈতিকায়ন (politicize) করে ফেলার যে মানসিকতা, তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানান। নারী এজেন্ডা একটি রাজনীতি-নিরপেক্ষ বিষয়, এটি নিয়ে যারা কাজ করবেন তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের সাথে এর কোন বিরোধ নেই। সুতরাং এ কাজটিতে সেভাবেই মনেযোগী হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

এ আলোচনার সূত্র ধরে *ড. সাদেকা হালিম* এক্ষেত্রে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির প্রসঙ্গ টেনে বলেন নারীদের উন্নয়ন দিক-নির্দেশনার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং নারী এজেন্ডা হিসেবে রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে সকল নারীর এটিকে সমর্থন দেয়া এবং এর অগ্রগতি সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। *ড. সাদেকা হালিম* জানান এ নীতি ১৯৯৭ সালে প্রণীত হবার পর ২০০৪ সালে গোপনে এটিকে পরিবর্তন করা হয়। ২০০৮ এ আবার এটি বিবেচনায় আনা হয় যেখানে নারীদের অংশগ্রহণ, বিশেষ করে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিষয়ে খুব পরিষ্কার নির্দেশনা রয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলোর যে খাতওয়ারী নীতিমালা তৈলী হচ্ছে সেখানে নারী এজেন্ডাগুলো বাছাই করা যাচ্ছে না এবং এক্ষেত্রে টার্মস অব রেফারেন্স বা কর্মপরিধিও স্পষ্ট নয় বলে তিনি জানান। প্রাতিষ্ঠানিক এসব প্রতিবন্ধকতার সাথে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারটি অনেকখানি সম্পৃক্ত। সুতরাং একটি সুনির্দিষ্ট নারী এজেন্ডা হিসেবে এটিকে বিবেচনা করে এ নীতির উন্নয়ন ও বাস্ত বায়নে সকলকে একযোগে কাজ করার কথা বলেন তিনি।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি

নারীর পূর্ণ ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে অপর যে বিষয়টি বিশেষ মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করা এবং একে প্রভাবিত করা প্রয়োজন বলে সংলাপে বক্তারা মত দেন, সেটি হল রাজনৈতিক সংস্কৃতি। *ড. সাদেকা হালিমের* মতে, পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় রাজনীতিও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত। ফলে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো – নেপাল, ভারত, বাংলাদেশ এসব দেশের রাজনীতিতে জনবল, অর্থবল, পেশীশক্তি, ক্ষমতার অপব্যবহার, সন্ত্রাস এগুলোর আধিক্য দেখা যায়। নারী প্রকৃতির কোমলতার দিকগুলো প্রয়োগ করার কোন সুযোগ এখানে নেই, যা কিনা প্রচলিত রাজনৈতিক অপচর্চাগুলোকে দূর করে একটি নতুন ধারার বিকাশ ঘটাতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. রওনক জাহানকে এ বিষয়টির ওপর আরও গভীরভাবে আলোকপাত করতে অনুরোধ জানান তিনি।

নারীদের ক্ষমতায় আস্থা না রাখতে পারার বিষয়টিও আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক বলে *ড. সাদেকা হালিম* মন্তব্য করেন। যদিও মন্ত্রিপরিষদে বর্তমানে ১৪ শতাংশ নারী রয়েছেন, তথাপি পুরুষ প্রভাবিত রাজনীতিতে এটি খুব গ্রহণযোগ্যতা পায়নি বলে ব্যক্ত করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদাহরণ দিয়ে বলেন, ধরেই নেয়া হয় যে পররাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট কুটনৈতিক সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বা স্বরাষ্ট্র'র আওতায় দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলার মত জটিল বিষয় মেয়েদের বোঝার কথা নয়। একারণে এখনও আমাদের অন্তর্জালা রয়ে গেছে যে কেন আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী একজন নারী এবং কেনই বা আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একজন

নারী। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নারীর ক্ষমতায় আস্থা রাখতে পারার বিষয়টি যতদিন না আসবে, ততদিন গুণগত কোন পরিবর্তন আসবে না বলেই *ড. সাদেকা হালিম* মত প্রকাশ করেন।

রাজনৈতিক দলগুলোর সংকীর্ণ মানসিকতার বিষয়টিতে আলোকপাত করেন *ড. বদিউল আলম মজুমদার*। উদাহরণ হিসেবে তিনি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রত্যেকটি কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব রাখার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবটি তুলে ধরেন। কিছু কিছু রাজনীতিবিদ এ প্রসঙ্গে নেতিবাচক মন্তব্য করেন, এমনকি কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেন বলে জানান তিনি। শেষ পর্যন্ত অস্পষ্টভাবে যে প্রতিশ্রুতিটি রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে তা হল ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলে ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করা হবে। তাছাড়া ছলে-বলে কলে-কৌশলে নির্বাচনে জেতার যে সংস্কৃতি বর্তমানে রয়েছে, তাতে নারীদেরকে ৩৩ শতাংশ, ৪০ শতাংশ কিংবা ৫০ শতাংশ – যত শতাংশ মনোনয়নই দেওয়া হোক না কেন, নারীর প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব বাড়ার সম্ভাবনা এক্ষেত্রে খুবই ক্ষীণ, যদি না বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে।

শুধু রাজনৈতিক দল নয়, এমনকি নির্বাচন কমিশনের আচরণও ক্ষেত্রবিশেষে প্রশ্নবিদ্ধ – এমন মন্তব্য করেন 'Bangladesh Alliance for Women Leadership (BDAWL)' এর নির্বাহী পরিচালক এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত *নাসিম ফেরদৌস*। খুব সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের একটি সেমিনারে গণ প্রতিনিধিত্ব আইন (RPO) সংস্কার প্রসঙ্গে খোদ নির্বাচন কমিশনের আচরণ অত্যন্ত আপত্তিজনক ছিল বলে জানান তিনি। রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ কোটা সংরক্ষণের ব্যাপারে গড়িমসি করছিল, তাতে নির্বাচন কমিশনের আরও শক্ত ভূমিকা নিতে পারা উচিত ছিল বলে তিনি মনে করেন। কেননা রাষ্ট্র স্বয়ং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণের অঙ্গীকার করেছে, এবং এসব উন্নয়ন লক্ষ্যে নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা আছে। আর শহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণের সময়সীমা যেহেতু ২০১৫ সাল, তাই দলগুলোর সর্বস্তরে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করা, আর ২০২১ সাল – যখন বাংলাদেশ তার ৫০তম বর্ষ উদযাপন করবে, তার মাঝে রাজনীতিতে ৫০ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব অর্জন করার লক্ষ্য পূরণে রাজনৈতিক দলগুলোকে এসব শর্ত মানার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আরও জোরদার হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন।

ড. জারিনা রহমান খান এ প্রসঙ্গে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো স্থানীয় সরকার পর্যায়ে পুরুষদের যতটা মনোনয়ন দেন, তাদেরকে যতটা সাহায্য-সহযোগিতা করেন, যতটা সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেন, নারীদের ক্ষেত্রে ততটা করেন না। নারী এবং পুরুষের প্রতি দলগুলোর একটি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। বৈষম্যমূলক এই দৃষ্টিভঙ্গী না বদলালে নারীদের জন্য ইতিবাচক একটি পরিবেশ কখনোই তৈরি হবে না।

সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সাংসদ *সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া* এ প্রসঙ্গে বলেন, বাস্তবতা হচ্ছে একটি মেয়ে যতই যোগ্য এবং দায়িত্বশীল হোক না কেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যতই অগ্রণী ভূমিকা পালন করুক না কেন, মনোনয়নের প্রশ্নে অগ্রাধিকার পাচ্ছেন একজন পুরুষ। সেটি কি আওয়ামী লীগ, কি বিএনপি – এ দুটি বৃহৎ দলেই মেয়েদের অবস্থানটি একইরকম কষ্টকর। এমনও দেখা গেছে একজন যোগ্য

শিক্ষিত নারীকে মনোনয়ন না দিয়ে মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে একজন অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত, হয়তো রাজনৈতিক কর্মীই নন, সমাজ সচেতনও নন, সংসদে খুব যোগ্য সাংসদ হিসেবে পরিচিত এমনও নন, এরকম একজনকেই। এমনও আছে এ দুটি বড় দলে যে কোন বিশেষ এলাকায় যতবার নির্বাচন হয়েছে, একজন পুরুষ প্রার্থী হয়তো ততবার বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছেন। তারপরেও একজন নারীকে না দিয়ে ঐ পরাজিত পুরুষ প্রার্থীকেই মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে। এটিকে পাপিয়া নারীর ব্যাপারে পুরুষের মানসিক মৌলবাদ আক্রান্ত মানসিকতার নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এ প্রসঙ্গে সাংসদ *নীলুফার চৌধুরী মনিও* তাঁর একই রকম অভিজ্ঞতার বর্ণনা তুলে ধরেন।

সাংসদ *সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া* বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি পুরুষ প্রভাবিত হবার কারণগুলো চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, সংসদে নারী-সংশ্লিষ্ট আইনগুলো পাশ করছেন পুরুষরাই। যদিও বড় দুটি দলের নেতৃত্বে রয়েছেন মহিলারা, কিন্তু তাদেরকে যারা পরিচালিত করছেন, প্রভাবিত করছেন, দলীয় এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতিগুলি প্রণয়ন করছেন সে সভাসদ মণ্ডলীর অধিকাংশই হলেন পুরুষ। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যেমন পুরুষদেরই আধিপত্য, তেমনি নির্বাচনী এলাকাগুলোও তাদেরই দখলে। একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে নির্বাচনী এলাকায় কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে *পাপিয়া* বলেন, সংরক্ষিত আসনের সাংসদ হিসেবে এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাকে সম্পৃক্ত হতে দেয়া হয় না। এর পেছনে যে কারণটি আছে বলে তিনি মনে করেন তা হল, একজন পুরুষ যে এলাকার সাংসদ, সেখানে যখন একজন মহিলা সাংসদ যাবেন, প্রতিদিন কর্মীদের সাথে, জনসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত হবেন, এ সম্পৃক্ততার কারণে তখন ক্রমশঃ তার অবস্থান নির্বাচিত ঐ পুরুষ সাংসদের চেয়ে ভালো হবে। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদ তার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারেন। স্বাভাবিক কারণেই এ ৩০০ সাধারণ আসনের নির্বাচিত পুরুষ প্রতিনিধিদের তরফ থেকে দলের উচ্চ পর্যায়ের কাছে আবেদন-নিবেদন থাকে যেন নারী সাংসদদের বেশি স্বাধীনতা না দেয়া হয়। যাতে একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভেতরেই তাদের বিচরণ থাকে, পাপিয়ার ভাষায়, 'পায়ে একটি শিকল থাকবে, শিকলে একটি লম্বা লোহার তালা থাকবে, যে তালার চাবিটি নীতি নির্ধারকের হাতে থাকবে' – সেটি তারা নিশ্চিত করতে চান। কাজেই এরকম পরিস্থিতিতে সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন বিদ্রূপেই পরিণত হয় বলে তিনি মনে করেন।

'ক্যাম্পে'র পরিচালক *রাশেদা কে. চৌধুরীও* রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার বিষয়টি তুলে ধরেন। তিন বলেন, 'আমি যদি এক দলের সাথে কাজ করি, অন্য দল আমাকে চিহ্নিত করে বসে থাকবে যে উনি একটি বিশেষ দলেরই প্রতিনিধি।' এ সংস্কৃতি যতদিন না দূর হবে, ততদিন নারীদের ইস্যুতে একটি মতানৈক্যে পৌঁছানো কঠিন হবে বলেই তিনি মনে করেন।

রাজনৈতিক সংস্কার

বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির নানা নেতিবাচক দিক সংলাপে আলোচিত হবার প্রেক্ষিতে বক্তারা বিশেষত এর নানামুখী সংস্কারের (reform) প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরেন। 'সুজন' এর সদস্য সচিব ড. *বদিউল আলম মজুমদার* বিশেষভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ যাতে আরও শক্তিশালী হয় সে ধরনের সংস্কারের উপর জোর দেন। সংরক্ষিত আসনের দুজন নারী সংসদ সদস্যের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ড. *মাহমুদা ইসলামও* উপলব্ধি করেন যে, রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার অত্যন্ত জরুরী এবং এ ব্যাপারে নারী

আন্দোলনের পক্ষ থেকে তাদের সাথে বিশেষভাবে কাজ করা প্রয়োজন। তিনি বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় নিয়ম-নীতি এবং রাজনীতি চর্চার সামগ্রিক পরিবেশটি যাতে আরও নারী বান্ধব হয় – সে ব্যাপারে দলগুলোকে জেন্ডার সংবেদনশীল করে তোলার কাজে নারী আন্দোলনের ভূমিকা আরও জোরদার করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন।

তবে *খুশি কবীর* এ প্রসঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করে বলেন, বাইরে থেকে রাজনৈতিক দলের সংস্কার সম্ভব নয়। বাইরে থেকে নারী আন্দোলনকারীরা রাজনৈতিক দলগুলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সম্পর্কে উপদেশ দেবেন বাস্তবে সেটি কার্যকর হবে না। কারণ যখন বাইরে থেকে এ ধরনের সংস্কার চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন তাতে আরও উল্টো ফল হয়। সুতরাং সংস্কারের বিষয়টি আসতে হবে দলের ভেতর থেকেই। নারী আন্দোলন হয়তো বড় জোর দিক-নির্দেশনা দিতে পারে, মতামত দিতে পারে, এবং প্রয়োজনে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজে থেকেই ভূমিকা নিতে হবে বলে তিনি অভিমত দেন।

শিরিন আখতার এ প্রসঙ্গে খুশি কবীরের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরের সংস্কার হয়তো নারী আন্দোলন করে দিতে পারবে না। তবে এটুকুও মনে রাখা দরকার যে বাইরের চাপটা যত বেশি তৈরি করা যাবে, ততই সংস্কার হবার সম্ভাবনা বাড়বে। কারণ এখন পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে যতগুলো প্রস্তাব দলগুলোর কাছে করা হয়েছে, একটিও তারা সহজভাবে মেনে নেয়নি বলে মনে করিয়ে দেন তিনি। যেমন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিটি কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার যে প্রস্তাব নির্বাচন কমিশন করেছে, তাতে দলগুলো খুব ইতিবাচকভাবে সাড়া দেয়নি। ২০২০ সালের মধ্যে করার একটি অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়েই তারা তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। আজকে সংরক্ষিত নারী আসন ১০০ তে উন্নীত করার যে প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী করেছেন, তার প্রেক্ষাপটে শিরিন আখতার সবাইকে ১৯৯৬ সালের সময়ের দিকে ফিরে তাকাতে বলেন। তখন রাজনৈতিক দলগুলো এমনও যুক্তি দিয়েছিল যে – "সংসদে তো জায়গা নেই, জায়গা দিব কেমন করে?" তাই *শিরিন আখতার* মনে করেন রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারে অবশ্যই নারী আন্দোলন এবং সুশীল সমাজের একটি বড় ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। তা নাহলে নারীর ক্ষমতায়নে কাঙ্খিত পরিবর্তন সুদূর পরাহত থেকে যাবে বলে তিনি মনে করেন।

রাশেদা কে. চৌধুরী রাজনৈতিক সংস্কার প্রসঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি, বিশেষ করে যারা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন, তাদের কাছে অনুরোধ করেন যেন তারা নারী আন্দোলন, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সাথে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, শলা-পরামর্শ করেন। কিন্তু তার পরবর্তী যে পদক্ষেপ, অর্থাৎ ফিরে গিয়ে সার্বিক পরিচালনায় (operational side) যারা থাকেন, সে আমলাদেরকে সংবেদনশীল করে তোলা, সক্রিয় করে তোলা, প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়ার কাজটি যাতে তাঁরা নিজেরা চালিয়ে নেন, তার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেন। তা নাহলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে পড়ে নারী নীতি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের যে প্রতিশ্রুতিগুলো আছে ইউএন, সিডও ইত্যাদি – সেগুলোর বাস্তবায়ন শ্লথ হয়ে পড়ার আশংকা থেকে যাবে। তিনি তাই সুনির্দিষ্টভাবে অন্তত প্রশাসন যন্ত্রটিকে সক্রিয় করার দাবি জানান।

সম্মিলিত ফলো আপ

নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি শুধু এককভাবে নারী আন্দোলনের বিষয় নয়, বা এটি শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর আওতার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি জাতীয় উন্নয়ন ইস্যু এবং এ দু'দলেরই এক্ষেত্রে স্পষ্ট ভূমিকা থাকা দরকার। কেননা আয়শা খানমের মতে, নারীরা যারা রাজনীতি করছেন তারা মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিবাচক সিদ্ধান্ত এবং অব্যাহত নারী আন্দোলন – এই দুটোর সমন্বিত ফল। সুতরাং নারী অগ্রগতির হার ফলো আপ করাটাও সকলেরই দায়িত্ব। অর্জন যতটুকু হয়েছে তা ধরে রাখতে হলে নিয়মিত ফলো আপ করতে হবে এবং এই ফলো আপ করা শুধু নারী আন্দোলনকারীদের দায়িত্ব নয়। রাজনীতিকদের একটি কার্যকর ভূমিকা এক্ষেত্রে ভীষণভাবে কাঙ্খিত বলে তিনি মনে করেন।

নির্বাচনী পদ্ধতি

বর্তমানে যে নির্বাচনী পদ্ধতি রয়েছে তাতে নারীদের প্রকৃত অন্তর্ভূক্তি হয় না, বরং তা অলঙ্কারিক পর্যায়েই থেকে যায় বলে মন্তব্য করেন *ড. বদিউল আলম মজুমদার*। এক্ষেত্রে তিনি অনেকগুলো বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। যেমন সম্প্রতি আওয়ামী লীগ নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য নির্বাচনী পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন প্রস্তাব করেছে তাতে বলা হয়েছে, পরোক্ষ নির্বাচনের পরিবর্তে নারীরা সরাসরি নির্বাচন করবেন। তবে তারা নির্বাচন করবেন প্রতি তিনটি আসনের জন্য। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা কোন প্রকৃত পরিবর্তন আসবে না বলেই *বদিউল আলম মজুমদার* মনে করেন। কেননা এত বড় নির্বাচনী এলাকা দেখভালের জন্য যে ব্যায়ভার সেটি কে বহণ করবে? এটি বরং নারীর জন্য অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। শুধু তাই নয়, প্রতি তিনটি আসনের জন্য একজন নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বৈত প্রতিনিধিত্ব বা dual representation এর ব্যাপারটিও থেকে যাচ্ছে। সুতরাং নারীর প্রকৃত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে যেসব মানদণ্ড বা criteria ড. জাহান প্রস্তাব করেছেন, যেমন – কাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন নারীরা, জবাবদিহিতা, সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, এগুলোর কোনটাই এতে পূরণ হবে কিনা তাতে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। ফলে এটি শুধু সংখ্যাই বাড়াবে, প্রকৃত কোন পরিবর্তন আনবে না বলে তিনি অভিমত দেন।

খুশি কবীর বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি প্রস্তাব করেন। নেপালে এ পদ্ধতি খুব ভালো কাজ করছে বলে জানান তিনি। নির্বাচনী পদ্ধতির ক্ষেত্রে মধ্যম মেয়াদের পদক্ষেপ হিসেবে এ পরিবর্তনের দিকে যাওয়া যেতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির বিপক্ষে মত দেন *ড. বদিউল আলম মজুমদার*। কেননা তাঁর মতে, এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হতে হলে রাজনৈতিক দল স্বচ্ছ হতে হবে, গণতান্ত্রিক হতে হবে, জনকল্যাণমুখী হতে হবে এবং দায়বদ্ধ হতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও উপযোগী এ পরিবেশ তৈরি হয়নি। বরং রাজনৈতিক দলগুলো এখানে সিন্ডিকেটের মত আচরণ করে, লুটপাটের অধিকার অর্জনের জন্য অনেক পায়তারা চলে। সুতরাং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি এখানে কতটুকু কার্যকর হবে সেটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। রাজনৈতিক দলের সংস্কার হলেই কেবল এ পদ্ধতি কাজ করবে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এ ধরনের সংস্কারের কোন অর্থবহ প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গৃহীত হয়নি, বলেন তিনি। বরং নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে যে 'গণ প্রতিনিধিত্ব আইন' পাশ হয়, তাতে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল করার যে ক্ষমতা ছিল নির্বাচন কমিশনের, তা রহিত করা হয়েছে। যেমন কোন দলে গণতন্ত্রের চর্চা না হলে, তৃণমূলের মতামতের ভিত্তিতে মনোনয়ন না দিলে, বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠন বিলুপ্ত না করলে নির্বাচন কমিশন ঐ দলের নিবন্ধন

বাতিল করতে পারতো। কিন্তু এখন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের এসব শর্ত মানাটা ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক নয়। নির্বাচন কমিশনকে এক অর্থে *কাগুজে বাঘ* বানিয়ে ফেলা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বদিউল আলম মজুমদার। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে খুব একটা পরিবর্তন আনা যাবে না। এক্ষেত্রে তিনি সমাধান হিসেবে রোটেশনাল পদ্ধতি প্রস্তাব করেন। তিনি ভারতের উদাহরণ দিয়ে বলেন, ভারতের তৃণমূলে পঞ্চায়েত সিস্টেমে রোটেশনাল পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে। এটি নিয়ে সেখানে কোন বিরোধিতা নেই, বরং সব দলই তা গ্রহণ করেছে। সুতরাং আমরাও এ পদ্ধতি প্রবর্তন করতে পারি। আর পদ্ধতিগত সংস্কারের ক্ষেত্রে ছোট থেকে বা তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করা দরকার বলে তিনি মনে করেন। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন নির্বাচন আইনগুলো যখন পাশ হবে, তখন যদি এইসব আইনগুলোতে রোটেশনাল পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত করা যায়, তাহলে এখান থেকেই পরিবর্তনের ধারাটি সূচিত হতে পারে, যেটি পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও প্রভাব ফেলতে পারে। তবে রোটেশনাল পদ্ধতির সবচেয়ে বড় বাঁধা হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেন পুরুষদের, এবং তাদের মানসিকতার। কারণ পুরুষরা আসনগুলোতে তাদের অধিকারকে অনেকটা জন্মগত অধিকার হিসেবে বিবেচনা করেন। এই মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করা দরকার বলেও তিনি মনে করেন।

ড. মজুমদার আরও জানান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একটি আইন হয়েছিল যেখানে রোটেশনাল ভিত্তিতে নারীদের জন্য ৪০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত হয়েছিল। এবং এটি মন্ত্রীপরিষদে পাশও হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজনৈতিক দলগুলো এটি সর্মথন করেনি এবং সংশ্লিষ্টরাও খুব একটা সোচ্চার হননি। যার ফলে একটি সুযোগ নষ্ট হয়েছে। তবে এখনও যে সুযোগগুলো রয়ে গেছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারা উচিত। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন – এ আইনগুলো আগামী কিছু দিনের মধ্যেই হবে। এক্ষেত্রে যদি সোচ্চার হওয়া যায় রোটেশনাল পদ্ধতি অন্তর্ভূক্তির জন্য তবে খানিকটা অগ্রগতি হবে। এছাড়া উপজেলা আইনও খুব দ্রুতই সংশোধন হবে। ওখানেও এটির অন্তর্ভূক্তি হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করা দরকার। প্রয়োজনে আন্দোলনের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। তবেই সংসদের আরও যে কয়েক বছর আছে, তার মধ্যে একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে বলে তিনি মনে করেন।

সংরক্ষিত আসনের সীমাবদ্ধতা

"সংরক্ষিত আসন পদ্ধতি অবশ্যই দরকার, কারণ এ পদ্ধতি কিছুদিনের জন্য চালু থাকলে তা নারীদের রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্ব করার একটি সুযোগ তৈরী করে দেয়। বলেন *ড. জারিনা রহমান খান*, 'কিন্তু একটু সাবধান হয়ে আমাদের বলতে হবে আমরা সংরক্ষিত আসন চাই।' নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা দরকার তখনই যখন সরাসরি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে মেয়েদের নানারকম প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। সেই প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন। এ যোগ্যতাগুলো যতদিন না নারীরা অর্জন করতে পারছেন, ততদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত নারী আসনের প্রয়োজন আছে। সুতরাং নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য সরক্ষিত আসনের প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে, তেমনি অনেকগুলো সীমাবদ্ধতাও এক্ষেত্রে রয়েছে যা সংলাপে উপস্থিত বক্তারা তুলে ধরেন। যতদিন এই বিষয়গুলোর সুরাহা না হবে, ততদিন সরক্ষিত আসনের মাধ্যমে নারীর সংখ্যাগত প্রতিনিধিত্বই বাড়বে, প্রকৃত ক্ষমতায়ন হবে না বলেই তাঁরা মনে করেন।

স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনগুলো ভিন্ন ধরনের একটি পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করে দিতে পারে, এরকম একটি সম্ভাবনার বিষয়ে সতর্ক করেন *ড. জারিনা রহমান খান*। কারণ নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোকে মনে করা হয় প্রতীকী বা দূর্বল। এগুলো দ্বিতীয় অবস্থানের আসন, মূল আসনের মর্যাদা এগুলোতে নেই। দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রেও ধরেই নেয়া হয় নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন, সাধারণ আসন তাদের জন্য নয়। এমনকি নারী প্রার্থীদেরকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনাও করা হয় না। সংরক্ষিত আসনের একজন নারী প্রার্থী যদি পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান, দলের পক্ষ থেকে সেটিকে উৎসাহিত করা হয় না। বলা হয় – তোমাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রয়েছে, তোমরা সেগুলোতে যাও, সাধারণ আসন পুরুষদের জন্য থাকবে। সুতরাং সংরক্ষিত আসনের বিষয়টিকে সমর্থন দেবার ব্যাপারে আরেকটু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন *ড. জারিনা রহমান খান*। তাঁর মতে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে কোটা নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের দ্বার খুলে দিয়েছে। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দলগুলো যদি নারীদের মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে অতটা উদ্যোগী নাও হয়, স্থানীয় সরকার পর্যায় থেকে যে নেতৃত্ব এখন গড়ে উঠছে, আগামী কিছুদিনের মাঝে তারা নিজেরাই উপরে চলে আসতে পারবেন। এবং তখন বাধ্য হয়েই রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও বেশি মনোনয়ন দিতে হবে নারীদেরকে। তাদের আলাদা করে সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজন হবেনা।

ড. সাদেকা হালিম সংরক্ষিত আসন প্রসঙ্গে বলেন, সংরক্ষিত আসনের সাংসদদের মাঝে sense of belonging নেই, কারণ তাদের সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা থাকে না। যেটিও বা থাকে, তাতে দ্বৈত প্রতিনিধিত্ব থাকায় যে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার বোধ তৈরি হবার কথা, তা সংরক্ষিত আসনের এসব প্রতিনিধিদের মাঝে তৈরি হয় না। বাজেট প্রণয়ন থেকে শুরু করে সব ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের সীমিত ভূমিকায় দেখা যায়। যেখানে সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রেই দায়বদ্ধতার বিষয়টি অত্যন্ত দূর্বল, সেখানে এতরকম পদ্ধতিগত প্রতিবন্ধকতায় ভোগা সংরক্ষিত আসনের প্রতিনিধিদের আসলে একটি জবাবাদিহিমূলক ভূমিকা রাখা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে করেন তিনি।

সংরক্ষিত আসনের সমস্যা বলতে গিয়ে মাননীয় সাংসদ *সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া* বলেন, 'আমরা যারা সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদ মনোনীত হয়েছি নির্বাচিত সংসদ সদস্য দ্বারা, আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে তাদের অবস্থানটি হচ্ছে এরকম যে সুসজ্জিত বিলাসবহুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত জাতীয় মহান সংসদে কোরাম পূরণের হাতিয়ার, অথবা হ্যা-না ভোট দেওয়ার দামী অলঙ্কার।' সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বাড়ানোর সরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি কেবল নারীদের সংখ্যাগত প্রতিনিধিত্বই বাড়াবে। কারণ বিড়ম্বনাটি হয় তখন যখন একজন নির্বাচিত সাংসদ এবং সংরক্ষিত আসনের সাংসদ উন্নয়নশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে যান, নির্বাচিত সাংসদই কেবল তখন সম্পৃক্ত হতে পারেন, সংরক্ষিত আসনের মনোনীত সাংসদ তা পারেন না। কারণ হিসেবে বলা হয়, বিগত সরকারের আমলে যে আইনটি পাশ করা হয়েছিল তাতে সংরক্ষিত আসনের সাংসদদের জন্য কোন নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ (constituency demarcation) করা হয়নি। এলাকা নির্ধারণ না করাটাই যদি একমাত্র সমস্যা হয়ে থাকে মেয়েদেরকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার, সেক্ষেত্রে নতুন একটি আইন পাশ করা যেতে পারে। অথবা বর্তমান আইনে সংশোধন আনা যেতে পারে। সর্বদলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে এটিকে কার্যকর করা যেতে পারে। সে ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেই। সুতরাং *পাপিয়া* মনে করেন সংরক্ষিত আসন নয়, পুরুষের পাশাপাশি নিজস্ব যোগ্যতাতেই নারীদের রাজনীতিতে আসা উচিত। সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন তখনই

থাকে যখন মেয়েদেরকে কোনভাবেই ঘর থেকে বের করা যায় না, মিছিল মিটিংয়ে আনা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশ সে জায়গাটি অনেক আগেই অতিক্রম করেছে। তাঁর মতে মনোনয়নের ক্ষেত্রে যদি প্রত্যেকটি দলকে, বিশেষ করে বৃহৎ দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিকে বাধ্যতামূলকভাবে মেয়েদের জন্য ২০ শতাংশ - ৩০ শতাংশ মনোনয়ন দিতে বলা যায়, তাহলে হয়তো সত্যিকার অর্থে মেয়েরা কিছুটা ক্ষমতায়িত হতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও সতর্কতার ব্যাপার আছে বলে *পাপিয়া* মনে করেন। কেননা এক্ষেত্রে যেটি হয় সেটি হল পরাজিত ডামি আসনগুলোতে মেয়েদেরকে মনোনয়ন দিয়ে দেয়া হয় যাতে তারা জিতে আসতে না পারেন। সুতরাং আইন করলেই হবে না, এর বাস্তবায়নটিও সতর্কতার সাথে মনিটর করতে হবে। আর মানসিকতা বদলাতে হবে। তা নাহলে সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন কখনোই হবে না।

সংরক্ষিত আসনের আরেকজন সাংসদ *নীলুফার চৌধুরী মনি* তার কাজের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, 'যাহা চাইলাম তাহা পাইলাম না, আর যাহা পাইলাম তাহা ভুল করিয়া পাইলাম'। তিনি বলেন, সংরক্ষিত আসনের সাংসদ হিসেবে প্রকৃত অর্থে কোন কাজই তিনি করতে পারছেন না, যদিও তারা কাজ করতে চান। তিনি বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী থাকা অবস্থায় মেধা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতেই পড়ালেখা করেছেন, রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজ করেছেন। কোন সংরক্ষিত আসনের বরাতে কোন সুবিধা নিয়ে নয়। সুতরাং সংরক্ষিত নয়, বরং সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা অর্জনের দিকেই মনোযোগ দেবার কথা বলেন তিনি। সংরক্ষিত আসনের সমস্যাগুলো বলতে গিয়ে তিনি বলেন, সংরক্ষিত আসনের ব্যাপ্তি সাধারণ তিনটি আসনের সমান হওয়ায় একজন নারীর পক্ষে কখনোই পুরো এলাকা জুড়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। সময়ও এখানে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ তিনটি আসন জুড়ে কাজ করবার পরেও তার নামের পাশে 'সংরক্ষিত' কথাটিই থেকে যায়। আর সব ধরনের উন্নয়ন তহবিলের জন্য শেষ পর্যন্ত পুরুষ সাংসদের কাছেই তাকে যেতে হয়। আসনের ব্যাপ্তি বড় হওয়ায় নির্বাচন ব্যয়ও এসব সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থীদের বেশি বহন করতে হয়। তাছাড়া সংরক্ষিত আসনের নারীদের এমন সব আসনেই মনোনয়ন দেয়া হয় যেখানে সাধারণভাবে ঐ নির্দিষ্ট দলের পাশ করার সম্ভাবনা নেই। শুধুমাত্র শতকরা হার ঠিক রাখার জন্য এসব আসনে নারীদের মনোনয়ন দেয়া হয়। ফলে এত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে একজন নারী প্রার্থীকে শেষ পর্যন্ত হেরে যেতে হয় তার চেয়ে অনেকাংশেই অযোগ্য একজন পুরুষ প্রার্থীর কাছে। সুতরাং কোন পেশীশক্তির ভিত্তিতে নয় কিংবা কারোর দয়ায় নয়, বরং নীলুফার নিজেকে দাঁড় করাতে চান মেধার ভিত্তিতে, যোগ্যতার মাপকাঠির বিচারে।

সংরক্ষিত আসনের অপর সাংসদ *রুবি রহমান* স্বীকার করেন যে সংরক্ষিত আসনের অনেকগুলো সমস্যা এবং সংকট রয়েছে। প্রশ্ন রয়ে গেছে যে সংরক্ষিত আসনে আসলে কতটুকু এগুনো যাচ্ছে বা এটি আদৌ এগিয়ে নিচ্ছে কিনা? এটি কি নারীদের রাজনীতিতে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে একটি সাহায্যকারী পদক্ষেপ, নাকি এটি আসলে একই জায়গায় নারীর অগ্রগতিকে, নারীর রাজনীতিতে ভূমিকা গ্রহণকে আটকে রাখছে? এটির দুটো দিকই রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। অনেকক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে সংরক্ষিত আসনে কাজ করা খুব কঠিন। নানারকম সীমাবদ্ধতা রয়েছে, ক্ষমতার অভাব রয়েছে এবং কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় নানারকম হতাশার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু পিছিয়ে পড়া আমাদের এ সমাজটাকে এগিয়ে নিতে এর খানিকটা হলেও ভূমিকা আছে বলে তিনি মনে করেন। আমাদের নারীরা পিছিয়ে আছেন বলেইতো নারী প্রগতি সম্পর্কে চিন্তা চলছে, আন্দোলন হচ্ছে, এবং সমস্যার উত্তরণের উপায় হিসেবে সংরক্ষিত কোটা পদ্ধতির প্রতি সমর্থনও রয়েছে। এই আসনে থেকে নারীর

ভূমিকাকে আদৌ এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়, এতটা নেতিবাচক দিক থেকে রুবি রহমান ব্যাপারটিকে দেখতে চান না। রাতারাতি যেমন সমাজ বদলে ফেলা যায় না, তেমনি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জন করতে প্রয়োজনে ৫ বছর, ১০ বছর, এমনকি ২০ বছরও অপেক্ষা করতে হতে পারে। এই সহিষ্ণুতা না থাকলে, সম্মিলিত প্রচেষ্টা না থাকলে কিছুই এগুনো যাবে না। সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদরা সত্যি অনেকরকম সীমাবদ্ধতার ভেতর দিয়ে কাজ করছেন, ক্ষমতায়নটা যথাযথ না হওয়ায় কাজ করার সদিচ্ছা থাকলেও অনেক সময় করতে পারছেন না। কিন্তু তিনি মনে করেন, সদিচ্ছা থাকলে অনেক বাঁধা বিঘ্ন অতিক্রম করেও মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। সুতরাং সীমাবদ্ধতার মাঝেও আশার আলো দেখতেই তিনি সকলকে অনুরোধ করেন।

এ প্রসঙ্গে 'BDAWL' এর নির্বাহী পরিচালক *নাসিম ফেরদৌস* বলেন, সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদদের আসলে কোন নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকার দরকার নেই। কারণ তাঁরা জাতীয় সংসদের প্রতিনিধি। জাতীয় সংসদ যেহেতু সবসময় জাতীয় ইস্যু নিয়েই কথা বলবে, জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সাংসদদের তাই জাতীয় পর্যায়ের ইস্যু নিয়েই চিন্তা করা উচিত। আর উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডগুলো ছেড়ে দেয়া উচিত স্থানীয় সরকোরের উপরে। এভাবেই কেবল আমরা সামনের দিকে এগোতে পারি। কেননা এ বিষয়গুলো নিয়ে নানান সময়ে নানান পর্যায়ে প্রচুর বিতর্কের অবতারণা হয়েছে, কিন্তু সুরাহা কিছু হয়নি।

স্থানীয় সরকার পর্যায়ঃ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি অনুকরণীয় মডেল

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন সম্পর্কে একটি মূল বিতর্ক হল এসব আসনের প্রতিনিধিরা আসলে কাকে প্রতিনিধিত্ব করেন – যারা তাদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচন করেন তাদের? না, যে এলাকার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি নির্বাচিত হন সে এলাকার জনগণের? *ড. জারিনা রহমান খান* বলেন, এ বিতর্কটি যতটা জাতীয় সংসদের প্রেক্ষাপটে সত্য, ততটা স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নয়। কারণ এ দুটি পর্যায়ের সংরক্ষিত নারী আসনের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন দুটি ভিন্ন ধরনের নির্বাচক গোষ্ঠীর মাধ্যমে। জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রে সাধারণ আসনের ৩০০ সাংসদ সংরক্ষিত আসনের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন। আর স্থানীয় সরকার পর্যায়ের প্রতিনিধিদের ভোট দেন ঐ এলাকার সকল সাধারণ নারী-পুরুষ। সে হিসেবে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হলেও স্থানীয় পর্যায়ের এসব নারী প্রতিনিধিরা আসলে তাঁর নির্বাচনী এলাকার সকলেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। সুতরাং জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের যে সমস্যা বিরাজমান, এর সমাধান খুঁজতে বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক পর্যায়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। স্থানীয় সরকারের দিকে তাকালেই এ সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মন্তব্য করেন *ড. জারিনা রহমান খান*।

ড. জারিনা আরও বলেন, স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা এখনও রয়ে গেছে। কিন্তু নারীর ক্ষমতায়নের দিক থেকে জাতীয় সংসদের তুলনায় এটি অনেক এগিয়ে রয়েছে। কেননা রাজনীতি মানে শুধু নির্বাচনী পদ্ধতি নয়, এর সাথে আরও অনেক বড় একটি প্রক্রিয়া জড়িত। এখানে রাজনৈতিক কর্মী তৈরি করা থেকে শুরু করে দলীয় মনোনয়ন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জেতা, জাতীয় বা স্থানীয় সরকার সংগঠনগুলোতে যাওয়া – এগুলো যেমন আছে; তেমনি আছে সমর্থক গোষ্ঠী প্রস্তুত করা, সাধারণ কর্মীদের সংশ্লিষ্ট করা। এ পুরো প্রক্রিয়াটিই রাজনীতি। *ড. জারিনা* বলেন, স্থানীয় সরকারে যখন ১৫ হাজার আসনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের ৪০ হাজার নারী কর্মীরা মাঠে নেমেছেন, তখন তাদেরও একটি হাতে খড়ি হয়েছে রাজনৈতিক এ প্রক্রিয়ায়। সুতরাং শুধু নির্বাচনটিকে ফোকাস

না করে পুরো রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটির সঙ্গে নারীদের সংশ্লিষ্ট করা, নেতৃত্ব তৈরি করা, তাদের মাঝে সাংগঠনিক ও নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরি করা – নারীদের রাজনীতিতে আনতে হলে এ বিষয়গুলোতেও সমানভাবে জোর দিতে হবে। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে এ কাজটি ভালোভাবেই শুরু হয়েছে এবং নারীদের মাঝে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটছে। তিনি মনে করেন, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে গড়ে ওঠা এ নেতৃত্ব থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। এখানে যে সমস্যাগুলো রয়ে গেছে সেগুলো যদি আমরা ঠিক করে নিই, তবে এটিকেই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি আদর্শ মডেল হিসেবে আমরা নিতে পারি।

স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সমস্যা চিহ্নিত করতে গিয়ে *ড. জারিনা* বলেন, স্থানীয় সরকারে অংশগ্রহণের ফলে নারীদের প্রকৃত ক্ষমতায়নের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে মাত্র, কিন্তু ক্ষমতা সেভাবে পায়নি। যে কারণে উপজেলা পর্যায়ের ভাইস চেয়ার এবং চেয়ার পদে যিনি নির্বাচন হয়েছেন সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আরও বেশি সংখ্যক নারীর উপজেলা পরিষদে আসার কথা থাকলেও, সেরকমটি দেখা যায়নি। সুতরাং সংখ্যার পাশাপাশি ক্ষমতাটিও থাকা চাই। ক্ষমতা না হলে শুধু সংখ্যা দিয়ে কোন লাভ নেই। যেখানে ইউনিয়ন পরিষদের একটি আসনকে ৩ জন পুরুষ এবং ১ জন নারী প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেখানে ক্ষমতার বন্টন সুষম করতে হবে।

এত সংকট থাকার পরেও স্থানীয় সরকারের নারীরা যেভাবে কাজ করছেন, প্রতিযোগিতা করে টিকে আছেন সেটি থেকে আমাদের অনুকরণীয় অনেক কিছুই আছে বলে মন্তব্য করেন 'কর্মজীবী নারী'র সভাপতি শিরিন আখতার।

মহিলা অধিদপ্তরের ভূমিকা

নারীর ক্ষমতায়নে মহিলা অধিদপ্তরের ভূমিকা আরও স্পষ্ট এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেন সাংসদ সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া। তিনি বলেন, শুধুমাত্র জেলা শহরে প্রতি বছর ২৫ জন দুঃস্থ মহিলার মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ, নিরক্ষর মহিলাদের অক্ষরজ্ঞান দান, কিংবা ৫০ জনের জন্য ১০০ টাকা করে বরাদ্দ রাখার মধ্যে এ অধিদপ্তরের ভূমিকা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। কারণ সত্যিকার অর্থে মহিলাদের বিষয় নিয়ে ভাববার জন্যে এ একটিমাত্র অধিদপ্তর রয়েছে। এটিকে তাই আরও সৃজনশীল ও কার্যকর করে তুলতে হবে। নারীদের ক্ষমতায়নে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলো দূর করতে সমাজের বিজ্ঞ মানুষদের পরামর্শ নেওয়া থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ জায়গা পর্যন্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করার কাজটি এ অধিদপ্তরকে করতে হবে। এবং প্রয়োজনে এর নেতৃত্বকে তাই অত্যন্ত গতিশীল এবং কর্মোদ্যোগী হতে হবে। কাঙ্খিত এ ভূমিকায় যদি মহিলা অধিদপ্তর যেতে পারে, তবে যে যে দলই করুক না কেন, নারীর অধিকার আদায়ের প্রশ্নে সবাই একত্রিত হবার একটি নিশ্চয়তা পাবে বলে পাপিয়া মনে করেন।

বৈচিত্র্যময়তার উপযোজন (Accommodation of Diversity)

নারীর সত্যিকারের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে *খুশি কবীর* নারীদের মাঝে যেসব বৈচিত্র্য রয়েছে, তার যথার্থ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার বিষয়টিতে জোর দেন। কারণ নারীদের মাঝে রয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণী, ধর্ম, পেশা, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থানের নানা জন। এমন অনেক নারীই আছেন যারা একেবারে ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর, যাদের কোন টাকা পয়সা নেই। কিন্তু তারাও ইউনিয়ন পরিষদে ভূমিকা রাখার জন্য আসছেন, উপজেলা নির্বাচনে ভাইস চেয়ার হয়েও আসছেন অনেকে, সাংসদ পর্যায়ে নির্বাচন করে অনেক নারী আসছেন যারা আগে সংরক্ষিত

আসনে ছিলেন, বা যারা ঢাকায় ওয়ার্ড কমিশনার ছিলেন । এঁদের প্রত্যেকের বাস্তবতা যেমন ভিন্ন, তেমনি তাঁদের প্রয়োজনেও রয়েছে বিভিন্নতা। সুতরাং প্রত্যেককে তাঁর অবস্থান থেকে যথাযথভাবে ক্ষমতায়িত করতে হলে তাঁর প্রয়োজন ও বাস্তবতার প্রতিফলন রাখতে হবে নীতিগত পর্যায়ে।

শিরিন আখতার মনে করেন, রাজনৈতিক দলগুলোতেও নারীদের এই বহুমুখীতার প্রতিফলন থাকা দরকার। এমনকি যারা দল করছেন না, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশায় আছেন, তাদের প্রতিনিধিত্বটি যদি দলে – বা শুধু রাজনৈতিক দলেই না, সংসদেও যদি বৃহত্তর এই বহুমুখীতার প্রতিনিধিত্ব থাকতো, তবে সংসদটি হয়তো অন্যরকম একটি রূপ নিতে পারতো। সমাজের সত্যিকারের আয়না হিসেবে কাজ করতে পারতো সংসদ বা রাজনৈতিক দলগুলো। সুতরাং সব ধরনের নারীদের কীভাবে সংসদে নেয়া যায়, সেটিও বিবেচনা করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

প্রক্সি নারী প্রতিনিধি

প্রক্সি নারী নির্বাচিত হবার প্রসঙ্গে *ড. সাদেকা হালিম* বলেন, প্রক্সি নারী প্রতিনিধিরা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী থেকে আসেন। তিনি জানান ১৯৯৭ সালে যখন নারীরা সরাসরি নির্বাচন করতে পারতেন, তখন তৃণমূল পর্যায়ের অনেক নারী নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন যাদের তেমন কোন মূলধনও ছিল না। কিন্তু সরাসরি নির্বাচনের পরিবর্তে যখন সংরক্ষিত আসনের বরাতে প্রক্সি নারীরা এ জায়গাগুলো নিয়ে নিচ্ছেন, তাতে করে বঞ্চিত হচ্ছেন সেইসব নারীরা যারা প্রকৃত প্রার্থী, যারা সত্যিই দায়িত্বশীল, কিন্তু তাদের হয়তোবা সেরকম যোগাযোগ বা নেটওয়ার্ক নেই বা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীগোষ্ঠীর মধ্যে তারা পড়েন না। এ বিষয়টি কঠোরভাবে মনিটর করা দরকার বলে মনে করেন তিনি।

ককাস গঠন

শিরিন আখতার নারীদের ইস্যুতে ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি ককাস গঠনের প্রস্তাব করেন। সংসদে যে নারীরা আছেন তারা যে যে দলই হোন না কেন, নারী ইস্যুতে এক হয়ে তারা যদি সকলে মিলে এ সংক্রান্ত একটি বিল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেন, সে বিলে সবাই যদি কাজ করেন এবং সবাই মিলে সমর্থন দেন সে বিলটি পাশ করার জন্য তাহলে বড় একটি কাজ হবে বলে তিনি মনে করেন।

এ প্রসঙ্গে *নাসিম ফেরদৌস* বলেন, নবম জাতীয় সংসদের সরাসরি এবং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় ককাস গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তখন কিছু প্রশ্নের উদ্ভব হয়। যেমন সংসদ সদস্য নীলুফার জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি যখন সংসদে থাকবেন না, তখন কি তিনি ককাসের অংশ থাকবেন? নাকি থাকবেন না? সুতরাং জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় ইস্যুকে এগিয়ে নিতে পারার জন্য সত্যিকার অর্থে কার্যকর একটি সর্বদলীয় ককাস গঠন জরুরী এবং রাজনৈতিক দলগুলোরই এক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত বলে মত দেন তিনি।

টেকসই অগ্রগতি (Sustained progress)

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ‘Policy, Leadership and Advocacy for Gender Equality’ (PLAGE) প্রকল্পের জেন্ডার উপদেষ্টা *জওশন আরা রহমান* টেকসই অগ্রগতির বিষয়টিতে

গুরুত্বারোপ করে বলেন, রাজনৈতিক অঙ্গনের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে যতটুকু অর্জনই আমাদের হয়েছে, সেটি কতটা টেকসই তার উপর আমাদের অর্জন অনেকখানি নির্ভর করছে। অর্জিত অগ্রগতিকে টেকসই করতে তিনি প্রথম যে পরামর্শটি দেন সেটি হল একটি সময় নির্ভর কর্মপরিকল্পনা বা time bound action plan তৈরি করা। এছাড়া কার্যকর একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা institutional structure প্রয়োজন। বাংলাদেশে খুব সুন্দর এরকম একটি প্রতিষ্ঠান আছে, যেটি কার্যকর করা হয়নি সেটি হল – National Council on Women's Advancement. এটিকে কার্যকর করা দরকার। এবং এটি কার্যকর করার জন্য এর যে বর্তমান চুক্তিভিত্তিক কর্মপরিধি রয়েছে তা পর্যালোচনা করে প্রয়োজন হলে তা নতুন করে তৈরি করা দরকার, যাতে নারীরা রাজনৈতিক অঙ্গনে কীভাবে এগিয়ে আসবেন, প্রশাসনে কীভাবে এগিয়ে আসবেন, তাদের ক্ষমতায়ন কীভাবে হবে, সে বিষয়গুলোতে আলোকপাত করা যায়।

সক্ষমতা অর্জন (Capacity building)

PLAGE প্রকল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ *নীলুফার আহমেদ করিম* সক্ষমতা অর্জনকে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন অর্জনের একটি কেন্দ্রীয় দিক বলে উল্লেখ করেন। এ লক্ষ্যে তাঁর প্রকল্পের আওতায় সক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত যেসব কাজ হচ্ছে তার বিবরণ তুলে ধরেন তিনি। তিনি জানান, সম্প্রতি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে 'জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা' তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া 'জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন' নিয়ে একটি কাজ চলছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে। পরিকল্পনা এবং বাজেট – এ দুটো ক্ষেত্রেই খুব জরুরী, আর যদি এগুলো প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা যায়, তবে নারীর ক্ষমতায়নের দিকে খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বর্তমানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় National Institute of Local Government (NILG) এর সাথে যৌথভাবে স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিদের 'জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা ও বাজেট' কীভাবে প্রণয়ন করা যায় তার উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের জন্যও এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। দীর্ঘ মেয়াদে নারীর ক্ষমতায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। আর সকল পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হয়তো সে লক্ষ্যে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্য: সেলিমা রহমান, যুগ্ম মহাসচিব, বিএনপি

সংলাপে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের যুগ্ম মহাসচিব *বেগম সেলিমা রহমান* তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। অধ্যাপক ড. রওনক জাহানকে তাঁর অত্যন্ত বিশদ উপস্থাপনার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানান তিনি। ড. জাহানের এ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বে নারী প্রতিনিধিত্বের একটি তুলনামূলক চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্বের পূর্ণ একটি চিত্রও পাওয়া গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কীভাবে নারী প্রতিনিধিত্বটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এর অনেককিছু সম্পর্কেই তাঁর পূর্বধারণা ছিল না বলে তিনি স্বীকার করেন। নারী আন্দোলনের নেত্রী আয়শা খানমকেও তিনি ধন্যবাদ জানান রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাবার জন্যে।

সেলিমা রহমান বলেন, শিক্ষা-সচেতনতায় এগিয়ে থাকা উন্নত দেশগুলোতে নারী প্রতিনিধিত্ব অনেক এগিয়ে গেলেও, আশার কথা হল আমাদের দেশও এক্ষেত্রে খুব একটা পিছিয়ে নেই। সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় অনুশাসন – এতসব বাঁধা সত্ত্বেও আমাদের দেশে নারী সমাজের অবস্থান উন্নত অনেক দেশের সাথে তুলনায় প্রায় একইরকম। এ অগ্রগতির পিছনে নারী আন্দোলনের অবদানকে স্বীকার করেন তিনি। এক্ষেত্রে কোটার মত ইতিবাচক পদক্ষেপগুলোও ভীষণভাবে কাজ করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সংরক্ষিত আসনের দুজন সাংসদের বক্তব্যের সাথে এখানে দ্বিমত প্রকাশ করে তিনি বলেন, সংরক্ষিত আসনের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখেছেন, সংরক্ষিত আসন থেকে পরবর্তিতে সরাসরি নির্বাচনে যাওয়ার ক্ষমতাটা চলে আসে।

তবে সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধিদের যে সমস্যাটি প্রধানত মোকাবিলা করতে হয়, *সেলিমা রহমানের* মতে সেটি হল পুরুষ সহকর্মীদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানান, সংরক্ষিত আসনের সাংসদ থাকা অবস্থায় তিনি কোনদিনও তাঁর এলাকার পুরুষ সাংসদদের পাশাপাশি থেকে কোন কাজ করতে পারেননি। এখানেই জেন্ডার সমতার প্রয়োজন, প্রয়োজন পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, বলেন *সেলিমা রহমান*।

নারীর পূর্ণ ক্ষমতায়নের জন্য মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্ব বিকাশের উপর তিনি জোর দেন। তিনি স্বীকার করেন, বিএনপিতে আওয়ামী লীগের তুলনায় নারী নেতৃত্ব কম আছে, আওয়ামী লীগ অনেক বেশি পুরোনো দল বলেই হয়তো সেখানে বেশি সংখ্যক মহিলারা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে রয়েছেন। নারীদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো গেলেই কেবল সামনের দিনগুলোতে স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের নেতৃত্ব আরও বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সংরক্ষিত নারী আসন সম্পর্কিত প্রস্তাবিত সংস্কার সম্পর্কে তিনি বলেন, সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ১০০ করা, এসব আসনে পরোক্ষ নির্বাচনের পরিবর্তে সরাসরি নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি – এগুলো সবই খুব ইতিবাচক উদ্যোগ এবং এগুলোকে তিনি স্বাগত জানান। তবে তিনটি আসন নিয়ে একজন মহিলার সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়টিতে অন্যান্যদের মত তিনিও প্রশ্ন তোলেন। এত বড় নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন করা একজন নারীর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করেন। এটিকে তিনি একটি অগ্নি পরীক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, শুধুমাত্র একজন নারী হওয়ার কারণেই কেন এ ধরনের কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে? একজন নারী কেন সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার পাবেন না? রাজনীতিতে নারীদের অধিকারের ব্যাপারে সকলকে সোচ্চার হতে অনুরোধ করেন তিনি।

বদিউল আলম মজুমদার নির্বাচনী পদ্ধতিতে যে রোটেশনাল পদ্ধতির প্রস্তাব করেছেন, সে সম্পর্কে *সেলিমা রহমান* দ্বিধা প্রকাশ করে বলেন, হয়তো এই পদ্ধতি কাজ করতে পারে। তবে কীভাবে এটি কাজ করবে তা খুব স্পষ্ট নয়। সুতরাং হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত না নিয়ে এটি নিয়ে আরও গবেষণা করা, এমনকি আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারটিও গবেষণা করে দেখা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। কোন্ পদ্ধতিতে নির্বাচন করলে মহিলারা সত্যিই উপকৃত হবেন, তা হয়তো এসব গবেষণার মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে পারে।

অপর যে বিষয়টিতে *সেলিমা রহমান* আলোকপাত করেন তা হল, মহিলা কাউন্সিলার, আগে যারা ওয়ার্ড কমিশনার ছিলেন, সেইসব কাউন্সিলারদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের অভাব। দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা, চিন্তা-ভাবনা চলছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউন্সিলারদের দায়িত্ব বন্টন করা হয়নি। ভাইস চেয়ারম্যান যারা নির্বাচিত হয়েছেন, ৪৭০ জন, তাদেরও একই অসুবিধা। তাদের ক্ষমতা নেই, নেতৃত্ব নেই, দায়িত্ব নেই, অধিকার নেই। সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদরাও একই কারণে প্রকৃত অর্থে প্রতিনিধিত্ব করতে পারছেন না। এগুলো যদি সুনির্দিষ্টভাবে সমাধান না করা যায়, তাহলে সত্যিকারভাবে নারী নেতৃত্ব, নারী প্রতিনিধিত্ব অর্জন করা সম্ভব হবে না।

নির্বাচনী আইনগুলোর ব্যাপারে তিনি বলেন, কিছু কিছু সংস্কার এক্ষেত্রে হয়েছে। যেমন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত পদ ৩৩ শতাংশে বৃদ্ধি, সরাসরি নির্বাচনে নির্দিষ্ট পরিমাণের উর্ধ্বে টাকা খরচ না করা ইত্যাদি। তবে দুঃখের বিষয় হল, আইনগুলো আছে ঠিকই, তবে এগুলোর প্রয়োগ নেই। তিনি তাঁর নিজের সরাসরি নির্বাচন করার অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বির কোটি কোটি টাকার বিপরীতে তিনি অতটা টাকা ছড়াতে পারেননি। টাকা আর পেশী শক্তি, এ দুটোর কারণে খুব অল্প মার্জিনে তিনি হেরে যান। নির্বাচনী আইনের সঠিক প্রয়োগ থাকলে তার প্রতিদ্বন্দ্বির মনোনয়নই বাতিল হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। সুতরাং টাকা আর পেশী শক্তি – এ দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী আইন দরকার, এবং অবশ্যই আইনগুলোর প্রয়োগ দরকার। সেলিমা রহমান বলেন, শুধু রাজনীতি থেকে এগুলো দূর করলেই চলবে না, পুরো সমাজ থেকেই অপসারণ করতে হবে। রাজনীতি সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই সংস্কার শুধু রাজনীতিতে আনলে হবে না, সংস্কার সমগ্র সমাজেই আনতে হবে। তা নাহলে সত্যিকার অর্থে কোন পরিবর্তন আসবে না। জেন্ডার সমতার পাশাপাশি সামাজিক এসব সংস্কারের বিষয়েও কাজ করতে হবে, বলেন সেলিমা রহমান। নারী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের এসব দিকেও কাজ করার অনুরোধ জানান তিনি।

জাতীয় ইস্যুতে বা নারী ইস্যুতে দলমত নির্বিশেষে এক হবার ব্যাপারে সেলিমা রহমান বলেন, বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ এ দুটি দলেরই নিজস্ব আদর্শ এবং লক্ষ্য আছে। দলীয় অভ্যন্তরীণ রাজনীতির চর্চারও একটি নিজস্ব ধরণ এদের আছে, যার বাইরে রাজনীতিকরা চাইলেও যেতে পারেন না। সুতরাং রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে এক হওয়া গেলেও, অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ে যেহেতু এক হওয়া সম্ভব হয় না, সেহেতু পারস্পরিক সমঝোতার একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম দলগুলো তৈরি করতে পারে না। কাজেই সেলিমা রহমান এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর দিক থেকে উদ্যোগ নেয়ার আশা না করে, বরং নারী আন্দোলনের দিক থেকেই উদ্যোগ নেয়ার ওপরে জোর দেন। প্রচলিত আইনগুলোকে আরও নারী-বান্ধব করা, নারীদেরকে আরও অধিক হারে মনোনয়ন দেওয়া, প্রস্তাবিত ১০০ সংরক্ষিত আসনে সুনির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে রাখা, এসব আসনের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব, অধিকার এবং কর্তৃত্ব সুনির্ধারিত করা – এসব ইস্যুতে নারী আন্দোলনের দিক থেকে যদি চাপ সৃষ্টি করা হয়, রাজনৈতিক দলগুলো তখন বাধ্য হবে চাপটা মানার জন্য। হয়তো ভেতর থেকে নারী রাজনীতিকরা এতে সমর্থন দিতে পারেন, কিন্তু সবসময় দলীয় চাপের মুখে তাঁদের পক্ষে সেটি সম্ভব নাও হতে পারে বলে স্বীকার করেন *সেলিমা রহমান*। তিনি এও স্বীকার করেন যে কথা দিয়েও অনেকসময় কথা রাখা সম্ভব হয় না। কাজেই এটি মেনেই বাইরে থেকে নারী আন্দোলনকে কাজ করে যেতে হবে। নারী রাজনীতিকদের পক্ষে

যতটা দলীয় নিয়মনীতি মেনে সহায়তা করা সম্ভব ততটা অবশ্যই তাঁরা করবেন। তবে মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে নারী আন্দোলনকারীদেরই।

শিক্ষা-দীক্ষা-সচেতনতা-মানসিকতা এসব ক্ষেত্রে সমাজের অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে, এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও এগিয়ে যাবো – এই আশাবাদ ব্যক্ত করে *সেলিমা রহমান* বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এবং বিএনপির চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাননীয় বেগম খালেদা জিয়া, এই দুই নেত্রীই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্য আন্দোলন-লড়াই করেছেন। এবং তাঁদের বিশেষ অবদানেই বাংলাদেশের রাজনীতি আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। কাজেই আমাদের নারী সমাজ পিছিয়ে নেই। হয়তো নারীদের এই প্রতিনিধিত্ব আরও অর্থবহ হতে পারতো, যা আমরা এখনও অর্জন করতে পারিনি। সামগ্রিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন অর্জন করতে নারী সমাজকে জাতীয় যে কোন ইস্যুতে এক হবার আহ্বান জানিয়ে বেগম সেলিমা রহমান তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যঃ মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি *মেহের আফরোজ চুমকি* 'নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন' বিষয়ক এই সংলাপের আয়োজক সিপিডিকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। ড. রওনক জাহানকে রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ দেয়ার পাশাপাশি, তিনি সংলাপ-সঞ্চালক অধ্যাপক রেহমান সোবহানকেও বিশেষ ধন্যবাদ জানান। কেননা তাঁর সভাপতিত্বের মধ্য দিয়ে উক্ত আলোচনায় একটি জেন্ডার সমতা তৈরি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী *ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী*কে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, ড. শিরীন ইতিমধ্যেই নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে বলে চুমকি আশা প্রকাশ করেন। চুমকি তাঁর এবং অন্যান্য নারী রাজনীতিকদের বর্তমান অবস্থানের পিছনে যোগ্য এসব নারী নেতৃবৃন্দের বলিষ্ঠ ভূমিকা স্বীকার করে তাঁদের প্রতি তাঁর বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক রওনক জাহান যে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনটি পেশ করেছেন, *চুমকি* মনে করেন সেটি একটি আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করেছে সকলের মাঝে। কারণ *ড. জাহানের* গবেষণায় দেখা যাচ্ছে একটি উন্নয়নশীল দেশ হলেও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেকাংশেই এগিয়ে আছে। অগ্রগতির এই হার ধরে রাখতে পারলে, সমস্যা যতটুকু আছে তা কাটিয়ে উঠে নারীর পূর্ণ ক্ষমতায়ন অর্জন করা অসম্ভব নয় বলেই মনে করেন *চুমকি*।

প্রথমেই যে বিষয়টিতে *চুমকি* আলোকপাত করেন তা হল নারী আন্দোলন নেত্রী এবং নারী রাজনীতিক – এ দুটি দলের মাঝে দূরত্ব বিশাল। তাদের এই দূরবর্তী অবস্থানের কারণে এ দুটি পক্ষকে অনেকসময় প্রতিপক্ষ বলেও ভুল হয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে অনেকটা *সেলিমা রহমানের* সঙ্গে সুর মিলিয়ে *চুমকি* বলেন, এ দুটি দলই নারী ইস্যু নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু নারী নেত্রী যাঁরা আছেন তাঁরা যেহেতু কোন দলীয় পদে নেই, সেকারণে

তাঁদের কোন দলীয় রীতি মানার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে যেকোন নারী ইস্যুতেই জোরালো একটি ভূমিকা তাঁরা রাখতে পারেন, যেটি নারী রাজনীতিকদের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না। যেকোন পদক্ষেপ নেওয়ার আগে নারী রাজনীতিকদের তাদের দলীয় ম্যান্ডেট এর বিষয়টিকে মাথায় রাখতে হয়। আন্দোলনে নামতে হলে দলীয় নেতৃত্বের অনুমতি নিতে হয়। ফলে চাইলেও সবসময় নারী ইস্যুতে শক্ত একটি অবস্থান নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে বাস্তবতায় নারী রাজনীতিকদের কাজ করতে হয়, সে বিষয়টিকে বিবেচনা করার অনুরোধ জানান তিনি। তবে *চুমকি* এও আশ্বস্ত করেন যে, এক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্তনের আভাস ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারী ইস্যুতে তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন এবং দলীয় যেকোন বিষয়ের উর্ধ্বে নারী ইস্যুকে অগ্রাধিকার দেবার কর্তৃত্ব নারী রাজনীতিকদের তিনি দিয়েছেন। নারীর সমস্যা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর এ কঠোর অবস্থান গুণগত বড় একটি পরিবর্তন এক্ষেত্রে আনবে বলে *চুমকি* বিশ্বাস করেন।

তবে নারী আন্দোলন নেত্রীদের পাশাপাশি নারী রাজনীতিকদেরও ক্ষেত্রবিশেষে জোরালো ভূমিকা রাখা প্রয়োজন বলে চুমকি মত দেন। এ প্রসঙ্গে সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধিদের ক্ষমতা নিশ্চিত না করে কেবল সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রে তাদের জোরালো ভূমিকায় দেখা যায়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। যিনি যে দলের সাংসদ, তার দল যখন ক্ষমতায় থাকে, তখন নানা হিসেব-নিকেশ করে নারী সাংসদরা চুপ থাকেন, কিন্তু বিরোধী দলে গেলেই আবার বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হন। এ প্রসঙ্গে *চুমকি* জানান, বিএনপি আমলে যখন তিরিশটা থেকে সংরক্ষিত আসন পঁয়তাল্লিশটা করা হয়, তখনও ক্ষমতায়নের বিষয়টি গ্রাহ্য না করে কেবল সংখ্যাই বাড়ানো হয়েছিল। তৎকালীন অনেক সাংসদ বিষয়টিতে ভেতরে ভেতরে অনেক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, দুঃখ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করেননি। কারণ তখন তারা ক্ষমতাসীন দলে ছিলেন। আজকে তারা ক্ষমতাসীন দলে নেই, তাই আজকে তারা আসন সংখ্যা ১০০ করার প্রতিবাদ করছেন। তখনও আসন সংখ্যা ৪৫ করার প্রতিবাদ তারা করতে পারতেন, এগুলোর গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারতেন। সামগ্রিকভাবে এ জোরালো ভূমিকাটি থাকলে একটা কিছু পরিবর্তন হতে পারতো। সুতরাং একে অপরকে দোষারোপ করার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে আজকের প্রেক্ষাপটে নারী রাজনীতিকদের দলমত নির্বিশেষে একটি জোরালো ভূমিকা নেয়ার অনুরোধ জানান *চুমকি*, তাতেই একটি পরিবর্তন আসবে বলে তিনি মনে করেন।

বর্তমান সরকারের প্রস্তাবিত ১০০ সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে *চুমকি* বলেন, সংখ্যা যতই বৃদ্ধি করা হোক, তাতে ফলাফল কিছু ভালো হবে না; যদি না সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করা না হয়। কারণ পদক্ষেপ যাই নেয়া হোক, এর বৃহত্তর উদ্দেশ্য হল নারীর ক্ষমতায়ন। এ প্রসঙ্গে *চুমকি* সংরক্ষিত আসনের সাংসদ হিসেবে তার নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলেন, তিনি যদি তখন কাজ না করতে পারতেন, তবে তার আজকের অবস্থানটিতে তিনি পৌঁছুতে পারতেন না। সেখানে তাকে অনেক চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে, এক পর্যায়ে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারও হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাঁচ বছর কাজ করতে না পারলে ঐ হুমকি কাটিয়ে তিনি আজকের অবস্থানে উঠে আসতে পারতেন না। সুতরাং সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদদের কাজ করার সুযোগটি তৈরি করতে হবে, ক্ষমতা তাদের দিতে হবে। তা নাহলে শুধু সংখ্যা বাড়িয়ে কোন ক্ষমতায়ন হবে না।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে বর্তমান নেতৃত্বের দৃঢ় সদিচ্ছা রয়েছে বলে জানান *চুমকি*। উদাহরণস্বরূপ নাগরিকত্ব আইনের বিষয়টি তিনি তুলে ধরেন। পূর্বে বাংলাদেশী কোন পুরুষ ভিন্ন নাগরিকত্বের কাউকে বিয়ে করলে তাদের সন্তান বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেতো, কিন্তু কোন বাংলাদেশী নারী ভিন্ন নাগরিকত্বের কাউকে বিয়ে করলে তাদের সন্তান বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেতো না। নতুন আইনে একজন নারীর সন্তানও বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাবে। গুরুত্বপূর্ণ এ আইনটি বর্তমান সংসদের সীমিত মেয়াদেই পাশ হয়েছে। এ বিষয়টি নারীর অধিকার বিষয়ে বর্তমান নেতৃত্বের সচেতনতার ইঙ্গিত বহন করে। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আরও বড় যে পদক্ষেপ বর্তমান নেতৃত্ব নিয়েছে সেটি হল গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নারীদের দেয়া হয়েছে, যেটি আগে কখনও চিন্তাই করা যায়নি। সুতরাং এসব আশার আলো নিয়ে বর্তমান গতিশীল নেতৃত্বে ধৈর্য্য এবং সহনশীলতা নিয়ে এগিয়ে গেলে একসময় লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন *চুমকি*।

সংরক্ষিত আসন থাকবে কি থাকবে না, কোটার প্রয়োজন আছে কি নেই – এ বিতর্কে *চুমকি* তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেন এভাবে, 'কোটা পদ্ধতিটি আজকে যখন আমাকে সাংসদ করার সুযোগ করে দিয়েছে, তাহলে আমি কেমন করে বলি যে, কোটা পদ্ধতি থাকা উচিত না?' তিনি মনে করেন কিছুদিনের জন্য হলেও, কোটা পদ্ধতিটি নারীদের জন্য রাখা উচিত। তবে এই কিছুদিনটা কত দিন, তা আলোচনা সাপেক্ষ। এটি সকলের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক করা দরকার। নারী উন্নয়ন নীতি যেমন সবার সাথে আলোচনা করেই প্রণয়ন করা হয়েছে, তেমনি যে বিষয়গুলো নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়ে গেছে, যেমন, সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, সংরক্ষিত আসনগুলোর এলাকা কী হবে, কিংবা আদৌ সংরক্ষিত আসন থাকবে কিনা, কোটা থাকবে কিনা, থাকলেও এগুলোর বাস্তবায়ন কীভাবে হবে – এসব বিষয়গুলো সবার সাথে আলোচনা করে, সবার মতামত নিয়েই ঠিক করা হবে বলে *চুমকি* আশ্বস্ত করেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে *চুমকি* বলেন, নিঃসন্দেহে এ কমিটির একটি বড় ভূমিকা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, বর্তমান সংসদের প্রথম অধিবেশনেই এ কমিটি পাশ হয়েছে। আগে এর সভাপতি করা হত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রীকে। কিন্তু এর কাজকে আরও গতিশীল এবং স্বচ্ছ করার জন্য মন্ত্রীর পরিবর্তে একজন সংসদ সদস্যকে সভাপতি করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। *চুমকি* আশা করেন, সদিচ্ছা থাকলে, মন-মানসিকতা চিন্তা-চেতনা একই হলে সকলে মিলে কাজ করার মধ্যে কোন জটিলতা হবে না। সকলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে, সকলের কাছ থেকে দিক নির্দেশনা নিয়েই এ কমিটি কাজ করবে বলে জানান তিনি।

সেলিমা রহমানের মত *চুমকিও* প্রত্যেক রাজনৈতিক দল যেন আরও অধিক হারে নারীদের মনোনয়ন দেয় সে বিষয়টিতে মনোযোগ দেয়ার কথা বলেন। এবার যেসব মহিলাদের মনোনয়ন দেয়া হয়েছে, তাদের অধিকাংশই পাশ করে আসতে পেরেছেন, জানান *চুমকি*। এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এ কৃতিত্বের অংশীদার বলে মনে করেন তিনি। কেননা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কয়েকটি পদক্ষেপের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তার মধ্যে একটি হল যথাযথ ভোটার লিস্ট, আর দ্বিতীয়টি হল নির্বাচনী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ। সাদাকালো পোস্টার এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডে অফিস করার পরিবর্তে প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করে অফিস করার কারণে খরচ অনেকখানি কমে গিয়েছিল, যার ফলে বিশেষ করে মহিলারা অনেকটাই লাভবান হয়েছেন। এ কারণে অনেক

বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাথে দ্বিমত থাকলেও *চুমকি* তাদের ভালো কাজের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা বোধ না করে তাদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, শুধু নতুন দিনের কথা বললেই হবে না, এজন্যে নিজেদেরও পরিবর্তন করতে হবে, নিজেদের ভুলত্রুটিগুলোকে সংশোধন করতে হবে এবং অন্যদের ভালো কাজের জন্য তাদেরকে যথাযথ স্বীকৃতিও দিতে হবে। তবেই নতুন দিনের আলো আমরা দেখতে পাবো বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন – এটি নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। তবে *চুমকি* মনে করেন এটি অর্জনে অনেকটা পথ আমরা এগিয়ে এসেছি, আর বাকি পথটুকুও আমরা অবশ্যই পার হতে পারবো। এবং এক সময় এ দেশে 'ফিফটি ফিফটি না, মোর দ্যান ফিফটিও হয়তো পার্লামেন্টে মহিলা আসতে পারে' সে আশা রেখে *চুমকি* তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যঃ ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী *ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী* প্রথমেই সিপিডি আয়োজিত 'রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্বঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের করণীয়' শীর্ষক সংলাপের সকল অভ্যাগতদের শুভেচ্ছা জানান। এই সংলাপে তাঁকে যোগদানের সুযোগ দেবার জন্যে আয়োজকদের তিনি বিশেষ ধন্যবাদ জানান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রওনক জাহানকে তার জ্ঞানগর্ভ এবং অত্যন্ত বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান তিনি। তিনি বলেন, উপস্থাপিত এই প্রবন্ধ এবং তার সূত্র ধরে যে আলোচনাটি হয়েছে, তা থেকে তিনি অনেক সমৃদ্ধ হয়েছেন। বিশেষ করে রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক অবস্থান থেকে শুরু করে দক্ষিণ এশীয় এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে অনেক কিছুই শিক্ষণীয় ছিল বলে তিনি মনে করেন।

দীর্ঘ এ আলোচনায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে বলে *ড. শিরীন* মন্তব্য করেন। তার মধ্যে বৈশ্বিক পর্যায়ে না গিয়ে তিনি বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সেখানেই খানিকটা আলোকপাত করার চেষ্টা করেন তাঁর বক্তব্যে। প্রথম যে বিষয়টিতে তিনি আলোকপাত করেন সেটি হচ্ছে – নারীদের জন্য কোটা। রাজনীতিতে নারীদের তুলনামূলক কম প্রতিনিধিত্বকে দ্রুত বাড়ানোর জন্য কোটার ব্যবহার অনেক বেশি প্রচলিত, এবং জনপ্রিয়। কিন্তু একই সাথে যে প্রশ্নটি কোটার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে সেটি হল, কোটার মাধ্যমে যে নারী প্রতিনিধিরা আসছেন, তাঁরা কতখানি প্রকৃত অর্থে রাজনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারছেন। এখানে মূল বিতর্কটি হল, নারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে সবসময় কি কোটার উপরেই নির্ভর করা হবে, নাকি এটিকে একটি অস্থায়ী পদক্ষেপ হিসেবে কিছুদিনের জন্য চালিয়ে নেয়া হবে, যতদিন না সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীদের আসার ক্ষেত্রটি তৈরি হয়? সরাসরি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে যেসব অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলো যতদিন না দূর করা যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্তই কি কোটার মাধ্যমে নারীদের এগিয়ে নেয়া হবে? নাকি কোটা থেকে সরাসরি নির্বাচনে যাবার দিকে এখনই অগ্রসর হওয়া উচিত? এ বিষয়গুলো সংলাপে গুরুত্ব পেয়েছে বলে *ড. শিরীন* চিহ্নিত করেন। এর পাশাপাশি আরও যে বিষয়টি আলোচনায় এসেছে তা

হল, বর্তমানে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাগুলোকে দূর করার ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ নিলে নারীরা সরাসরি নির্বাচনে আসতে পারেন? এ সবগুলো বিষয়ই গভীর পর্যালোচনার দাবিদার বলে মনে করেন তিনি।

অপর যে বিষয়টিতে ড. শিরীন দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তা হল, কোটার মাধ্যমে কি শুধু নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাগত বা শতকরা হার নিশ্চিত করা হবে, নাকি সংরক্ষিত আসনের প্রতিনিধিরা যাতে সত্যিকারভাবে অর্থপূর্ণ একটি ভূমিকা নিতে পারেন সেটিও নিশ্চিত করা দরকার? সেটি যদি করতেই হয়, তাহলে কীভাবে করা যায়? আর যতদিন পর্যন্ত সে পরিবর্তনটি না আসছে, ততদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত নারী আসনের সাংসদরা কী করবেন? তাঁরা কি কতগুলো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলো নারীদেরকে খুব মৌলিকভাবে প্রভাবিত করে, যেমন নারী নির্যাতন, নারী উন্নয়ন, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি – এসব ক্ষেত্রে সারা দেশে ইস্যুভিত্তিকভাবে কিছু কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন? এসবই গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার। এজন্যে সংসদে সরাসরি নির্বাচিত এবং সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য – এঁদের সকলকে নিয়ে নারীদের জন্য একটি ককাস গঠন করা যেতে পারে যেটি একটি critical mass হিসেবে নারীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে, সেগুলোর ব্যাপারে সোচ্চার হবে, বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরবে এবং সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করবে। আর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ, সংরক্ষিত – সব আসনের প্রতিনিধিরাই ভূমিকা রাখতে পারেন বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন *ড. শিরীন*।

সংরক্ষিত ১০০ টি নারী আসনে নির্বাচনের সম্ভাব্য অনেকগুলো দিক সংলাপে উঠে এসেছে বলে *ড. শিরীন* উল্লেখ করেন। নির্বাচনী পদ্ধতির যে বিভিন্ন ধরন আছে, এফপিটিপি, পিআর সিস্টেম, নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে এগুলোর কোন সমন্বয়টি সবচেয়ে ভালো কাজ করে, সম্ভাব্য কোন উপায়ে এটি করা যায় সে ব্যাপারে এ আলোচনা থেকে অনেক কিছুই জানা গেছে। এখন সকলের সাথে আরও ব্যাপক পরামর্শের মাধ্যমে সম্ভাব্য সে সমাধানে পৌঁছুতে আরও সুদৃঢ় এবং গঠনমূলক কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহায়তা থাকবে বলে জানান তিনি।

এ কাজে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা উল্লেখ করতে গিয়ে *ড. শিরীন* জানান, মন্ত্রণালয়ের কার্য পরিধির ভেতর থেকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নারী উন্নয়ন করার যে যে ক্ষেত্রগুলোকে আরও সক্রিয় করা দরকার, সে জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। মন্ত্রণালয়ের একটি বড় শক্তি হল সারা দেশজুড়ে এর নেটওয়ার্ক। ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায় থেকে শুরু করে, উপজেলা থেকে ডেপুটি কমিশনার পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে এ নেটওয়ার্কগুলো রয়েছে। এ নেটওয়ার্কগুলোকে যদি সক্রিয় করে তোলা যায়, কার্যকর করা যায়, তাহলে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি সংলাপে অংশগ্রহণকারী অনেকের মত অনেকখানি অগ্রগামী বলে মনে করেন *ড. শিরীনও*। কেননা ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, ৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধে এদেশের নারীরা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজপথে মিছিল করেছেন, মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারী সমাজের রয়েছে একটি অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল এবং ঐতিহ্যবাহী অবদান। তবে এই অর্জন আপনাআপনি হয়নি। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম এবং আন্দোলন। সেই দীর্ঘ সংগ্রামের পেছনে যেসব নারী নেত্রীবৃন্দ অনেক ত্যাগ

স্বীকার করেছেন, অনেক কঠিন পথ অতিক্রম করেছেন এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন, সে সব নারী নেত্রীবৃন্দের প্রতি *ড. শিরীন* তাঁর গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দিনবদলের যে অঙ্গীকার রয়েছে সে অঙ্গীকার পূরণে কী করা যায় এবং বিরাজমান সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা যায় – সে ব্যাপারে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ, সহযোগিতা এবং সম্পৃক্ততা খুবই গভীরভাবে কামনা করেন তিনি। *ড. শিরীন* জানান, সরকারের দিক থেকে আন্তরিক চেষ্টা এবং উদ্যোগ সবসময়ই থাকবে। যেকোন বিষয়ে আলোচনার জন্যে তারা সবসময়ই প্রস্তুত। কেননা তিনি বিশ্বাস করেন যে একটি ব্যাপক আলোচনার ভেতর দিয়েই কেবল সুন্দর একটি সমাধান বেরিয়ে আসে। নারী অধিকারের প্রশ্নে সকল দল, গোষ্ঠী, মতের উর্ধ্বে উঠে সমন্বিত একটি উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান তিনি সকলকে। এদেশের তৃণমূল পর্যায়ে, স্থানীয় পর্যায়ে যে নারী নেতৃত্বরা আসছেন, তাদেরকে কীভাবে মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা যায় এবং ভবিষ্যতে কীভাবে আরও অধিক সংখ্যক নারীকে রাজনীতিতে আনা যায় এবং তাদের একটা অর্থবহ অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, সে বিষয়গুলোর প্রতি আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে হবে বলে মত দেন তিনি।

ড. জাহানের উপস্থাপিত প্রবন্ধ থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বেশ একটা অগ্রণী ভূমিকায় আছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে নেপাল সবচেয়ে অগ্রসর অবস্থানে রয়েছে, তার পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। সুতরাং বাংলাদেশের এ অর্জনগুলো অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। হয়তো সে আশার জায়গাটিতে ছোট ছোট কিছু হতাশাও রয়েছে। তবে সে হতাশাগুলোর মাঝে ডুবে না গিয়ে বরং সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানান *ড. শিরীন*। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের যে ধারা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই হবে, পিছনে হাঁটার কোন সুযোগ এখানে নেই। বৈশ্বিক এবং দক্ষিণ এশীয় অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশকে নারী উন্নয়নের একটি রোল মডেল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি সবাইকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নে সর্বাত্মক একনিষ্ঠ এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী। তিনি যে মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন, সেখানেও এর একটি প্রতিফলন আছে। সুতরাং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, আর সকলের সমন্বিত উদ্যোগ, পরামর্শ, সম্পৃক্ততা এবং সহায়তায় নারীদের জন্য দৃশ্যমান এবং প্রকৃত একটি পরিবর্তনের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব বলে আশা প্রকাশ করেন *ড. শিরীন*।

সভাপতির বক্তব্য

সবশেষে সভাপতি *অধ্যাপক রেহমান সোবহান* সংলাপে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান অনেক উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সংলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং নানা গঠনমূলক মতামত রাখার জন্য। তিনি মন্তব্য করেন, এতসব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এতটা সময় নিয়ে এত দীর্ঘ সংলাপে অংশগ্রহণ করেছেন, এমন সংলাপ তিনি খুব বেশি একটা দেখেননি। তিনি তাই সংলাপে উপস্থিত সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এ আলোচনার মাধ্যমে যে অঙ্গীকারগুলো ব্যক্ত হয়েছে, সে অঙ্গীকার, সে প্রতিশ্রুতিগুলো একটি আইনি কাঠামোয় নেয়ার প্রচেষ্টা অতি সত্ত্বর গৃহীত হবে। আগামী এক বছরের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি বিল সংসদে উত্থাপিত হবে, সে প্রতিশ্রুতিই সকলে এখানে ব্যক্ত করেছেন বলে *অধ্যাপক সোবহান* মনে করেন। সংসদের বর্তমান টার্ম শেষ হবার আগেই যাতে আইনি এ প্রক্রিয়াটি শুরু এবং শেষ করা যায় সে বিষয়ে সবিশেষ জোর দেন তিনি। তিনি আরও বলেন যে, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে জবাবদিহি রাখার ব্যাপারে সিপিডি তার উদ্যোগ

গ্রহণ অব্যাহত রাখবে। তিনি উপস্থিত সাংসদদের অনুরোধ করেন যার যার রাজনৈতিক দলের চেতনা প্রখর করা এবং উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জনে এ ধরনের আরও সংলাপ আয়োজনের আশা রেখে এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে *অধ্যাপক রেহমান সোবহান* সংলাপের ইতি ঘোষণা করেন।

উপসংহার

বাংলাদেশের উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রেই নারীদের অজস্র অবদান রয়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গনও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সামাজিক-ঐতিহাসিক নানা কারণে তাঁদের এ অবদানের মুল্যায়ন এবং স্বীকৃতি সেভাবে মেলেনি। বরং নানানভাবেই রাজনৈতিক ক্ষমতার মানচিত্রে তাঁদের প্রান্তিকীকরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সেসব অপচেষ্টাকে রুখে দিয়ে বাংলাদেশের নারীরা সবসময়ই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থানীয় সরকারের তৃণমূল পর্যায়ের নারীরা, যাঁরা ন্যুনতম সহায়তা ছাড়া কেবল একক প্রচেষ্টায় সকল অপচেষ্টাকে ডিঙিয়ে নিজস্ব অবদান রেখে চলেছেন রাজনীতিতে। তাঁদের অংশগ্রহণের এ প্রবণতা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এবং তা অচিরেই রাজনীতিতে ক্ষমতার হিসেব-নিকেশ বদলে দিতে পারে। অসীম সম্ভাবনাময় এসব নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে এ সংলাপে। *ড. রওনক জাহানের* নিরীক্ষাধর্মী গবেষণা এক্ষেত্রে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে নানানমুখী যে সমস্যাগুলো রয়েছে তার সমাধান খোঁজার একটি সচেতন প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। সংলাপে উপস্থিত নানা শ্রেণীপেশার নারী ও পুরুষ সহকর্মীদের মূল্যবান অনেক অন্তর্দৃষ্টির প্রতিফলন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিরাজমান নানা প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনাগুলোকে খুঁজে বের করার বাড়তি চালিকাশক্তির যোগান দিয়েছে। আশা করা যায় রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সার্বিক ক্ষমতায়ন, নারীর উন্নয়ন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্দীপনা যোগাবে এ সংলাপ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলো।

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা
(বর্ণানুক্রম অনুসারে)

মিজ শিরিন আক্তার	সাধারণ সম্পাদক, জাসদ এবং সভাপতি, কর্মজীবী নারী
মিজ মেহের আফরোজ	সংসদ সদস্য এবং সভাপতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া	সংসদ সদস্য
জনাব নাজমুল আহসান	উপ পরিচালক, শক্তি ফাউন্ডেশন
ড. মাহমুদা ইসলাম	অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সদস্য, উইমেন ফর উইমেন
মিজ খুশী কবীর	সদস্য, সিপিডি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এবং সমন্বয়ক, নিজেরা করি
মিজ রোকিয়া কবির	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংস্থা
মিজ নীলুফার আহমেদ করিম	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি বিশেষজ্ঞ পলিসি লিডারশিপ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি
মিজ আয়েশা খানম	সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
মিজ মাহমুদা রহমান খান	সিনিয়র প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট স্পেশিয়ালিস্ট জেন্ডার ও ডোনার কোঅর্ডিনেটর প্রোগ্রাম অফিস ইউএসএইড/বাংলাদেশ
ড. জারিনা রহমান খান	অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মিজ রাশেদা কে. চৌধুরী	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং পরিচালক, ক্যাম্পে
ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী	সংসদ সদস্য এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকার
মিজ নিলুফার চৌধুরী মনি	সংসদ সদস্য
অধ্যাপক রওনাক জাহান	সিনিয়র রিসার্চ স্কলার, সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউট, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
মিজ নাসিম ফেরদৌস	নির্বাহী পরিচালক, বিডিএডবিওএল এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত
মিজ আপনান বানু	প্রভাষক, শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
মিজ নিলুফার বেগম	সাধারণ ব্যবস্থাপক, শক্তি ফাউন্ডেশন
ড. বদরুল আলম মজুমদার	সদস্য সচিব, সুজন এবং কান্ট্রি ডিরেকটর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
মিজ সিমিন মাহমুদ	গবেষণা পরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
মিজ সারা যাকের	নির্বাহী পরিচালক, এশিয়াটিক মার্কেটিং কমিউনিকেশন্স লি.
মিজ জওশন আরা রহমান	জেন্ডার উপদেষ্টা, পলিসি লিডারশিপ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি
মিজ রুবি রহমান	সংসদ সদস্য
বেগম সেলিমা রহমান	যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং

	প্রাক্তন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী
জনাব রঘুনাথ রাহা	উপ পরিচালক, ব্রতী
জনাব বিভু রঞ্জন সরকার	কনসালটেন্ট, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট
জনাব এম সাইদুজ্জামান	সদস্য, সিপিডি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী
মিজ প্রমিতা সেনগুপ্ত	কর্মসূচী সমন্বয়ক, জার্মান টেকনিক্যাল কোঅপারেশন
মিজ মাহিন সুলতানা	সদস্য, নারীপক্ষ
মিজ নিগার সুলতানা	ম্যানেজার, ওমেন রিক্সস, একশন এইড বাংলাদেশ
অধ্যাপক রেহমান সোবহান	চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ
ড. সাদেকা হালিম	কমিশনার, তথ্য কমিশন
ড. হামিদা হোসেন	প্রাক্তন পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আইন ও সালিশ কেন্দ্র

সাংবাদিকের তালিকা
(বর্ণানুক্রম অনুসারে)

মিজ নাজনিন আক্তার	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক জনকণ্ঠ
জনাব জয়নাল আবেদীন	সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা
মিজ আলফা আনজু	স্টাফ রিপোর্টার, দ্য ডেইলি স্টার
জনাব মো: আমিনুজ্জামান	ফটোসাংবাদিক, ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস
জনাব শিবলি রেজা আহমেদ	স্টাফ রিপোর্টার, রেডিও টুডে
মিজ সাইয়েদা ইসলাম মিতা	স্টাফ রিপোর্টার, এবিসি রেডিও এফএম ৮৯.২
জনাব আবুল সাদত মো: শাহিনুর ইসলাম	রিপোর্টার, দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট
জনাব জসিমউদ্দিন	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ইত্তেফাক
জনাব বিশ্বজিৎ দত্ত	চিফ রিপোর্টার, দৈনিক আমাদের সময়
জনাব মহিউদ্দিন নয়ন	রিপোর্টার, দৈনিক করতোয়া
জনাব ইফতেফার মাহমুদ	স্টাফ রিপোর্টার, প্রথম আলো
জনাব মানিক মুন্তাসির	স্টাফ রিপোর্টার, ভোরের ডাক
জনাব এম জি শাহনী	সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা
জনাব সাদেকুর রহমান	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সংগ্রাম
জনাব আরিফুর রহমান	রিপোর্টার, নিউজ নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ
জনাব জাইদ আল ইসলাম রোহান	স্টাফ রিপোর্টার, বডি নিউজ ২৪
মিজ কাজি রুনা	রিপোর্টার, দেশ টিভি
জনাব শাহজাহান শুভ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা, দৈনিক ইনকিলাব
জনাব হাসান সানতুনু	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক আমার দেশ
জনাব মুনিমা সুলতানা	রিপোর্টার, ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস